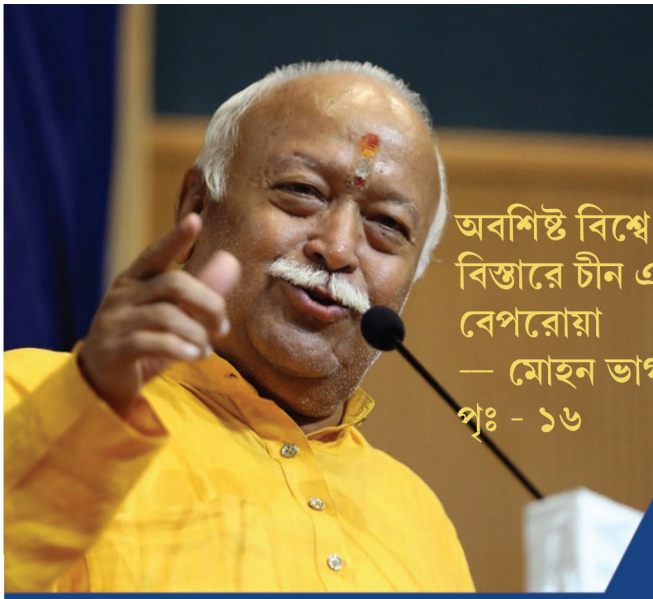

অবশিষ্ট বিশ্বে প্রভাব বিস্তারে চীন এখন বেপরোয়া
— মোহন ভাগবত
পৃঃ - ১৬

দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ৭ ডিসেম্বর ২০২০
২১ অগ্রহায়ণ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২
website : www.eswastika.com

## পিএম কিষাণ সম্মান নিধি

১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অর্থে বছরে ৬ হাজার টাকা পাবেন কৃষক।

## পিএম কিষাণ সম্মান নিধি

ভারতে প্রায় ১৪ কোটি কৃষক এই অর্থ পাবার যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটা প্রায় ৭০ লক্ষ।

## পিএম কিষাণ সম্মান নিধি

ভারতে এখনও পর্যন্ত ৯.৯৭ কোটি কৃষক এই অর্থ পেয়েছেন। রাজ্য সরকারের বিরোধিতার ফলে পশ্চিমবঙ্গে একজন কৃষকও এই টাকা পাননি।

## কৃষি বিল ২০২০

কৃষকরা তার উৎপাদিত ফসল যে কোনো জায়গায় বিক্রি করতে পারে। ন্যুনতম সহায়ক মূল্য হেরফের হবে না। বর্তমানে যেসব মান্ডি আছে সেগুলো যথারীতি চলবে।

কেন্দ্রীয় কৃষি বিল কৃষকদের স্বার্থে। এর ফলে রাজনীতির কারবারি ও ধান্ধাবাজ ফড়েদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার ভয়েই কৃষকদের নাম ভাঁড়িয়ে আন্দোলনের এই মহড়া।

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

# करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

# दन्त कान्ति

## दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

**पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है**
**आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए**

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा ग्राफिट
एजुकेशनल चैरिटी के
लिए समर्पित है

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৩ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৭ ডিসেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৪

**জরুরি অবস্থার সময় বামপন্থীদের দেখা পাওয়া যায়নি** ▯ সৌমিত্র সেন ▯ ৫

**দালালের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায় কেন্দ্র** ▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ৭

**দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের নামে যা হচ্ছে, তা কৃষকের নয়** ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ১০

**ভারতের অর্থনীতি পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের দিকে** ▯ ১২

**সম্মান খুইয়ে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকরা শাসক দলের ভোটপ্রচারে** ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১৪

**গোরু পাচার আটকানো যাচ্ছে না, তবে কি সরষের মধ্যেই ভূত?** ▯ ১৫

**অবশিষ্ট বিশ্বে প্রভাব বিস্তারে চীন এখন বেপরোয়া : মোহন ভাগবত** ▯ ১৬

**করোনাকালে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে উত্তর দিনাজপুরের গ্রন্থাগারগুলির বইপত্র** ▯ ১৭

**মুসলমান ভোট মেরুকরণ চলবে, হিন্দু ভোট চলবে না** ▯ মনোরঞ্জন জোয়ারদার ▯ ১৮

**পঁচাত্তরটি বছর কি যথেষ্ট নয় দেশনেতার অসম্পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ করার জন্য?** ▯ শুক্লা শিকদার ▯ ২০

**দুর্জনের ছলের অভাব হয় না, গোপন নথি তুলে ধরলো চীনের চেহারা** ▯ ২৩

**ভারতকে লগ্নির পীঠস্থান করে তুলতে নয়টি সোপান** ▯ অজয় শ্রীবাস্তব ▯ ২৫

**চিঠিপত্র** ▯ ২৭

**মধ্যযুগের ইউরোপে নারী ছিল শয়তানের কল** ▯ সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৯

**কাশ্মীরে পণ্ডিতদের জমিচুরিতে সবচেয়ে লাভবান ফারুক আবদুল্লা** ▯ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ▯ ৩১

**লোকশিল্পের চাহিদা বাড়লে উপকৃত হবে অসংগঠিত ক্ষেত্র** ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩৪

**ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ** ▯ ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ৩৮

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## জনবিরোধী সরকারের পতন আসন্ন

ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা না হইলেও ইহার ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এই শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি পাশাপাশি অবস্থান করিয়া দেশকে বিকাশের পথে লইয়া যায়। পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশ তথা রাজ্যবাসীর মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। জাতীয় নীতি প্রণয়নে রাজ্যগুলির অংশগ্রহণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করিবার একটি শর্ত —ইহাও সংবিধানে বলা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও দায়িত্বের বণ্টন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে নাগরিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভারতের ন্যায় কল্যাণকামী রাষ্ট্রে নাগরিকবৃন্দের ক্ষতি বা কোনো প্রকারের বঞ্চনা কাম্য নহে। কল্যাণকামী কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের লক্ষ্যই হইল নাগরিকদের কল্যাণ করা। কেননা দেশের নাগরিকদের লইয়াই দেশ গঠিত হয়।

অতীব দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতেই কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, ইহার একটি কারণ হইল আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান। আঞ্চলিক দলগুলির কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি না থাকিবার ফলে কেবলমাত্র আগামী নির্বাচনে যে কোনো প্রকারে জয়লাভ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পর কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী ও প্রকৃত কল্যাণকামী সরকার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেও কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। বর্তমান কেন্দ্র সরকারের দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণার্থে বেশ কয়েকটি প্রকল্প কয়েকটি রাজ্য সরকার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকল্পগুলির মধ্যে রহিয়াছে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি' এবং 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প'। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক সম্মান নিধি যোজনা ২০২০ সালে চালু করিয়াছে। ইহার আওতায় কেন্দ্র সরকার দুই হেক্টর জমির মালিক এমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বৎসরে ছয় হাজার টাকা প্রদান করিবে। এই টাকা সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক খাতায় স্থানান্তরিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, ইহার দ্বারা কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার সাহায্য প্রদান করিবে। ইহার জন্য কেন্দ্র সরকার বৎসরে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কল্যাণে ইহা কেন্দ্র সরকারের নিশ্চয় একটি বড়ো পদক্ষেপ। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের গরিব কৃষকদের কল্যাণে তাহাদের প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সম্মান নিধির আওতায় আনিতে নারাজ হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য বঞ্চিত হইয়াছেন রাজ্যের দরিদ্র কৃষকরা।

কৃষক সম্মান নিধির পূর্বে 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প'-ও রাজ্যে লাগু হইতে দেন নাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বাজেট পেশের দিন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই যোজনায় দশ কোটি পরিবারের পঞ্চাশ কোটি মানুষকে সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে প্রতিটি পরিবার পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাইবে। সরকারি ও বেসরকারি দুই হাসপাতালেই এই সুবিধা পাওয়া যাইবে। হাসপাতালে ভর্তির আগের ও পরের খরচও ইহাতে ধরা থাকিবে। নিঃসন্দেহে ইহাতে রাজ্যবাসী উপকৃত হইতেন। মুখ্যমন্ত্রী এই স্বাস্থ্য বিমা হইতেও রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ও কৃষক সম্মান নিধির মতো কল্যাণকর প্রকল্প রাজ্যে লাগু হইতে না দিয়া নিঃসন্দেহে রাজ্যবাসীর প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যে চালু না করা লইয়া পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি-সহ চার রাজ্যের জবাব তলব করিয়াছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। তিনি পালটা জানিয়েছেন, রাজ্যবাসীর জন্য রাজ্যে আলাদা ব্যবস্থা রহিয়াছে। সর্বোচ্চ আদালতের তলবে অবশেষে রাজি হইয়াছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আয়ুষ্মান ভারত ও কৃষক সম্মান নিধি চালু করিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছেন তিনি।

জনকল্যাণকর কেন্দ্রীয় যোজনার সুবিধা হইতে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করাকে মোটেই ভালো চক্ষে দেখিতেছেন না রাজ্যবাসী। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল দলটি টিকিয়া রহিয়াছে উপরি পাওনার উপরে । কেন্দ্রীয় প্রকল্প হইতে কোনো প্রকার কাটমানির সুযোগ না থাকায় এই প্রকল্প দুইটি কার্যকর করিতে তাহাদের কোনোরূপ আগ্রহ নাই। কিন্তু রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত ও শোষিত করিবার ফল তাহাদের ভোগ করিতেই হইবে। একুশের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জনবিরোধী এই রাজ্য সরকারকে বিদায় করিয়া জনকল্যাণকারী সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই শেষের শুরু তৃণমূলদলে শুরু হইয়া গিয়াছে।

## সুভাষিতম্

*অস্তীত্যেব কৃষিং কুর্যাৎ অস্তি নাস্তীতি বাণিজ্যম্।*

*নাস্তীত্যেব ঋণং দদ্যাৎ নাহমস্তীতি সাহসম্।।*

যা হবে তার চেয়ে বেশি আশা করে কৃষিকাজ করতে হবে, লাভ অথবা ক্ষতি— দুটির জন্যই তৈরি থেকে বাণিজ্য করতে হবে, ফেরত পাওয়া যাবে না— এরূপ ভেবেই ধার দিতে হবে এবং মৃত্যু হতে পারে ভেবেও সাহসে এগিয়ে যেতে হবে।

# জরুরি অবস্থার সময় বামপন্থীদের দেখা পাওয়া যায়নি

**সৌমিত্র সেন**

কিছু ঘটনাবলী স্মৃতিপটে ছাপ রেখে যায়। আজকের দিনে তা শুধুই নীরব ইতিহাস। অথচ ইসব ঘটনা অতীতের কতই না বর্ণময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী পালাবদলের নেপথ্যের নীরব সাক্ষী।

আমরা অনেকেই তখন নেহাত কিশোর, বালক, সদ্যোজাত শিশু বা অনেকের তখন জন্মই হয়নি। বিশ্ব রাজনীতির বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ। ভিয়েতনাম মুক্তিফৌজের একের এক পর বিজয়। সিয়াচীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতন, শেখ মুজিবুরের সপরিবারে হত্যা ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন।

সেই সময়েই মানে ১৯৭৫ সালে ভারত পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ পঞ্চম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সিকিম ঘোষিত হয় ভারতের ২২তম রাজ্য। ভারত আর্যভট্ট উৎক্ষেপণ করে। সেই বছরেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন গভীর রাতে জরুরি অবস্থা জারি হয়। আগের রাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে দিয়ে জরুরি অবস্থার নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করান ইন্দিরা গান্ধী। রেডিয়োতে তিনি বললেন— 'The President has proclaimed Emergency. There is nothing to panic about.' ('অযথা আতঙ্কিত হবেন না। রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেছেন')। সংবিধানকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে গণতন্ত্রকে হত্যার কালো ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। ওই ঘোষণার আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনেক সদস্যেরই অজানা ছিল যে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হতে চলেছে। জরুরি অবস্থা জারির পাশাপাশি সংবাদপত্র যাতে প্রকাশিত হতে না পারে তাই দুদিন ছাপাখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বহু বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, শ্রমিক নেতা জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করায় গ্রেপ্তার হন। সারা দেশে ও বিশেষত মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের কালো ভ্যানের অবিরত আনাগোনা এবং সিআরপি ও রাজ্য পুলিশের ভারী বুটের শব্দে হাড় হিম করা অনুভূতি হতো সকলের। প্রতিটি মানুষ, ছাত্র, সেবামূলক সংস্থা ও সামাজিক সংগঠনগুলি এক শীতল আতঙ্কের আবহের শিকার হয়েছিল।

**রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে জরুরি অবস্থায় সমূহ প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়। সভা, সমিতি, জনসংযোগ, প্রকাশনা সব কিছুই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তা সত্ত্বেও জরুরি অবস্থার বিরোধিতার পথ থেকে সঙ্ঘ সরে আসেনি। সঙ্ঘেরই একমাত্র সারা দেশব্যাপী সংগঠন ছিল যার মাধ্যমে সঙ্ঘের জনসংযোগ অন্য রাজনৈতিক দলগুলির মতো ব্যাহত হয়নি।**

ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন ওই সময় জাতীয় স্বার্থে এমনই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবটা ছিল একটু ভিন্ন। ১৯৭৩ সালে গুজরাটের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেলের মুখ্যমন্ত্রিত্বে সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আহমেদাবাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রেরা ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। এক মাস পরেই গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। যা 'নবনির্বাণ আন্দোলন' নামে পরিচিত। গুজরাটের অনুরূপ আন্দোলন দানা বাঁধে বিহারেও। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষীয়ান নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ৭১ বছরের জয়প্রকাশ নারায়ণের (জেপি) নেতৃত্বে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিহার। রামলীলা ময়দানে জয়প্রকাশ নারায়ণ বিপুল সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তখন জয়প্রকাশ বলেছিলেন, 'বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ'। বিহারের আন্দোলনে দেশ যখন জ্বলে উঠেছে তখনই রেল ধর্মঘটে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জর্জ ফার্নান্ডেজ। ১৯৭৪ সালের মে মাসে ধর্মঘটের জেরে অচল হয়ে গিয়েছিল যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা।

ছাত্র ও শ্রমিক ইউনিয়নের বিক্ষোভের পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধীকে সেই সময় দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন সোশ্যালিস্ট নেতা রাজনারায়ণ। তিনি ১৯৭১ সালে রায়বেরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে ইন্দিরা জয়ী হয়েছিলেন বলে মামলা দায়ের করেছিলেন। দেশে অশান্তির আবহে

১৯৭৫-এর ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ইন্দিরাকে দোষী সাব্যস্ত করে। তাই সমস্ত প্রতিকূলতার হাত থেকে মুক্তির চাবিকাঠি হিসেবেই তিনি রাতের অন্ধকারে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

সমস্ত বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় সে সময়ে। জগজীবন রাম, হেমবতী বহুগুণা, চন্দ্রশেখর বন্দি হন। অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, সুব্রহ্মণ্যনিয়াম স্বামী, অরুণ জেটলি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও গ্রেপ্তার হন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বহু প্রচারক ও কার্যকর্তাকে জেলে পাঠানো হয়। সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস-সহ প্রথম সারির অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদে লোক সংঘর্ষ সমিতি গঠিত হয় এবং জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করার জন্য লক্ষাধিক স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কারাবরণ করেন। মিসা আইনে ধৃত ৩০ হাজার জনের মধ্যে ২৫ হাজারই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন। সঙ্ঘের ১০০ জন কার্যকর্তার জরুরি অবস্থা চলাকালীন পুলিশের নির্যাতনে কারাগারে অথবা বাইরে মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে জরুরি অবস্থায় সমূহ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। সভা, সমিতি, জনসংযোগ, প্রকাশনা সব কিছুই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তা সত্ত্বেও জরুরি অবস্থার বিরোধিতার পথ থেকে সঙ্ঘ সরে আসেনি। সঙ্ঘেরই একমাত্র সারা দেশব্যাপী সংগঠন ছিল যার মাধ্যমে সঙ্ঘের জনসংযোগ অন্য রাজনৈতিক দলগুলির মতো ব্যাহত হয়নি।

জয়প্রকাশ নারায়ণ গ্রেপ্তার হবার পূর্বে লোক সংঘর্ষ সমিতির আন্দোলনের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক নানাজী দেশমুখের উপর অর্পণ করেন। নানাজী দেশমুখের কারাবরণের পরে সেই দায়িত্ব সর্বসম্মত ভাবে সুন্দর সিংহ ভাণ্ডারীর ওপর ন্যস্ত হয়। ওই সময়ে কংগ্রেস সরকার কোনও নির্বাচন করেনি। দেশের মানুষের সব রকম স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমেরও স্বাধীনতা ছিল না। সমাজবিদ শ্যামনন্দন মিশ্র, মধু দণ্ডবতেকেও কারাবরণ করতে হয়েছিল।

ক্ষমতার গদিতে আসীন থাকতেই ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পরামর্শে জরুরি অবস্থা জারি করেন। ইন্দিরাপুত্র সঞ্জয় গান্ধীর তুর্কমান গেটে বুলডোজার চালিয়ে গরিব মানুষদের উচ্ছেদ ইন্দিরার সেই কালো শাসনকে আরও কলঙ্কিত করে তোলে। সঞ্জয় গান্ধীর স্বৈরাচারের নির্দশন তুলে ধরায় অমৃতলাল নাহাটা পরিচালিত 'কিস্সা কুর্সি কা' চলচিত্রটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় ও পুড়িয়ে ফেলে প্রমাণ লোপাট করা হয়। অনৈতিকভাবে দেশ শাসনের চাবিকাঠি সকলের অলক্ষ্যে চলে আসে সঞ্জয় গান্ধীর হাতে। বংশীলালের মতো কিছু চাটুকার বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে সঞ্জয়ই দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ান। আইনের শাসন প্রহসনে পর্যবসিত হয়ে যায়।

সেসময় পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর) এবং তাদের প্রকাশনাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ৯৮টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এগারো হাজারেরও বেশি মানুষ বেকার হন। দেড় হাজারের মতো শ্রমিক ছাঁটাই হয়। ৩৯২টা কারখানায় লে-অফ হয়, লক্ষাধিক শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। জরুরি অবস্থায় ভারতে ১৪৭টা পত্রিকা ও পশ্চিমবঙ্গে ৩০টা পত্রিকা বন্ধ করা হয়। সমাজ সচেতনতার আতঙ্কে ২৬টি রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করা হয়। গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত-সহ পশ্চিমবঙ্গের আট জন স্বনামধন্য সাংবাদিক গ্রেপ্তার হন। তখন সম্পাদকীয় কলম লেখা যেত না, খালি রাখতে হতো। সে সময়ে সারা দেশব্যাপী ইন্দিরা বিরোধী আন্দোলনের বাতাবরণ রচনা করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা এলে তিনি যুব কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষিত জরুরি অবস্থার সমর্থনে আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেদিন জয়প্রকাশজীর যাত্রাপথের গতি রোধ করেছিলেন। তাঁর গাড়ির বনেটের উপর উঠে নৃত্যও করেছিলেন। এই আচরণেই প্রকাশ পায় যে, মমতা ব্যানার্জি গণতন্ত্র কখনই মানতেন না, বরং ফ্যাসিবাদেরই আরাধনা করতেন। সিদ্ধার্থ শঙ্করের পরামর্শে মেইনটেন্যান্স অব ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (মিসা) আইন চালু হয়। জরুরি অবস্থার 'মিসা' ধারায় গ্রেপ্তার হন ৬২৪৪ জন, তার মধ্যে ৫০০৯ জনই পশ্চিমবঙ্গের আর তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। বামপন্থীদের সেদিন টিকির নাগালও পাওয়া যায়নি।

বিনা বিচারে যে কোনো ব্যক্তিকে জেলে বন্দি করে রাখার জন্য নতুন করে মিসা অর্ডিন্যান্স হিসেবে চালু হয়েছিল। এই আইনে বামপন্থী এবং কংগ্রেসেরও বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাতে শ্রমিক, কর্মচারী, খেতমজুর, কৃষক, সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারে তাই মিশা, ডিআইআর ইত্যাদি আইনে গ্রেপ্তার ও জেলে পুলিশি অত্যাচারের ভয় দেখানো হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এক বিরাট পুলিশরাজ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই সময়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংগঠন ও জমায়েতের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না।

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাশি চলিয়েছিল। নকশাল পরবর্তী সময়ে শান্তি স্থাপনার নামে আন্দোলনরত মেধাবী ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করে লাশও লোপাট করা হয়েছিল। সিদ্ধার্থ শঙ্করের সুশিক্ষিত পুলিশ নিপুণ হস্তে নিঃশব্দে সেই সব হত্যালীলা সমাধা করেছিল। সংবাদপত্র, নাটক ও চলচ্চিত্রের ওপরে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেই ক্ষান্ত হননি। চলচ্চিত্রের এককালের বিশিষ্ট অভিনেতা ও জনপ্রিয় গায়ক কিশোর কুমারের হিন্দি ছবিতে কাজ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যুব কংগ্রেসের আয়োজিত দিল্লির সংগীত সন্ধ্যায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি বলে তাঁর রেডিয়ো প্রোগ্রামও বাতিল করা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু হরণ করে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছিল। সর্বপ্রকার গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের শেষ সীমা অতিক্রম করেছিল। ২১ মাসের কালাকানুনের শেষে দেশব্যাপী প্রবল বিরোধী বাতাবরণে কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচনে পর্যুদস্ত হন ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার পর শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের মাঠে ধূলিঝড় উড়িয়ে হেলিপ্যাডে অবতরণ করল একদা আশ্রমকন্যার সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার। তখনও 'এগিয়ে বাঙ্গলা'। ছাতা হাতে সুসজ্জিত মানুদা লম্বা পদক্ষেপে ম্যাডামের সঙ্গে তাল রাখছেন। আমি তখন এনসিসি করি। শুরু হলো 'গার্ড অব অনার'। অকম্পিত কণ্ঠে কমান্ড হলো 'সেলামি শাস্ত্র'। জাতীয় পতাকা উঠলো—ব্যান্ডে বাজলো জাতীয় সংগীত। অপলক চক্ষে চেয়েছিলাম একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারের একনিষ্ঠ পূজারিণির দিকে। সেই বছরেই কেন্দ্রে ও রাজ্যে কলঙ্কিত কায়েমি রাজত্বের অবসান হয়ে রাজনৈতিক পালা বদল হয়। পরাস্ত হন এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের নায়িকা। কলঙ্ক থেকে মুক্তিলাভ করে ভারত। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র। ▯

# দালালের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায় কেন্দ্র

**কল্যাণ গৌতম**

অলিগলিতে জোর চর্চা, 'কেন্দ্র দিতে চায়, রাজ্য নিতে চায় না।' মাঠেঘাটের মানুষ বলছেন, রাজ্য সরকার কৃষক দরদি নয়, দরদি সাজতে দড়। ওটাই ওপেন সিক্রেট, 'সে কহে অধিক মিছে/ যে কহে বিস্তর।' কিন্তু ওই যে! 'উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে'! সাধারণ্যের বলবার ভাষা বন্ধ। ভাষা রাখা আছে একুশের বুথে-বুথান্তরে। যদি নরেন্দ্র-প্রহরী ভরসা দেন অহরহ, ফর্সা হয়ে যাবে পাড়া-মহল্লার যাবতীয় মোচ্ছব। তবে মনে রাখতে হবে তিনি 'অঘটন-ঘটন পটিয়সী', 'দুধেল গোরু'-তে তাঁর আস্থা, 'সংঘাত-রমণী'র জোর 'গুড়-বাতাসা'য়। সব রাজ্য যা করে, তিনি উল্টোটাই করেন, দেশের সঙ্গে হাঁটেন না; আলাদা চটি, আলাদা রং, আলাদা লোগো। রামের সঙ্গে নেই— নানান 'রংধনু'-র সঙ্গে আছেন, আর আছে নবান্নের 'ফিশফ্রাই'। তাই বঙ্গপ্রদেশের মানুষ ক্রমাগত বঞ্চিত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ যে দেশের সঙ্গে হাঁটতে পারে না, তা এক 'ঐতিহাসিক সত্য', বাম আমলেও দেখেছে রাজ্য। 'আয়ুষ্মান ভারত', 'কৃষক সম্মান নিধি'— এই হলো তার সাম্প্রতিক পারম্পর্য।

এখন প্রশ্ন, এ রাজ্য 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি' চালু করলো না কেন? ২০১৪ সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি এ বিষয়ে সুর চড়িয়েছে, রাজ্য কেন্দ্রের কোনো সামাজিক কল্যাণকামী প্রকল্পে সায় দেয় না, শামিল হয় না। দীর্ঘ টালবাহানার পর কেন শর্তসাপেক্ষে প্রকল্প শুরু করতে চেয়ে চিঠি দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার? উত্তরটা পেতে হলে বিস্তর পড়াশোনা করতে হয় না। যে টাকা সরাসরি গরিব কৃষকের কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেবার শপথ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তা বঙ্গ-শাসকদলের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে, তাই।

'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' বললে, আর যে পুজোই হোক ভোট পুজো চলে না! পিএম-কিষান সম্মান নিধি হলো এমনই একশো শতাংশ কৃষক-প্রকল্প যেখানে টাকার স্রোত লোলুপ জিহ্বা এড়িয়ে চলে গেছে সেবামূলক পথে। তবে বেনিফিশিয়ারি লিস্ট চেক করে অনুমোদনের দায় রাজ্যের। লিস্টে ভুয়ো নাম থাকার প্রশ্ন বাদ দিলে, কৃষক ব্যাঙ্ক থেকে নিজ হাতে টাকা তুলে না দিলে 'তোলা' কাটমানিজীবীদের কাছে অধরাই থেকে যাচ্ছে। বিপত্তিটা— এইখানেই। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের কাজই এইরকম— সর্বত্র দালালি , সামাজিক দূষণ দূর করা। কৃষি-পণ্যের বাজারে মান্ডিতে প্রচলিত অজস্র দালালি দূর করার জন্য চালু হয়েছে 'এক দেশ এক হাট'-এর কানুন। মানুষের জন্য কাজ করতে হলে 'স্ট্রেইট ব্যাট'-এ খেলতে হয়। আর বেহাতে খেলেন রাজনীতির কারবারিরা! যেদিন গরিব-গুর্বো মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সক্রিয় হতে লাগলো, সেদিনই শুরু হয়েছিল শুভ-অশুভের লড়াই। শুভবোধ মানুষকে স্বস্তি দিতে চায়, অশুভশক্তি তার উপর বাটপাড়ি করতে আসে। বাধা পেলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটায়। প্রয়োজনে দেশি-বিদেশি নানান অপশক্তির হাত ধরে সংহতি লাভ করে।

**কৃষক-বান্ধব সম্মান নিধি প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়ন না হলে এরাজ্যের সরকার কৃষক বিরোধী সরকার এটাই প্রমাণিত হবে। তার থেকে বেরিয়ে আসার একটা সম্মানজনক পথ খুঁজছে মমতা সরকার।**

২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চালু হয়ে যায় 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি' প্রকল্প। যেখানে কৃষক বছরে তিনটি সমান কিস্তিতে মোট ছয় হাজার টাকা সরাসরি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাবেন। এ রাজ্যে সম্ভাব্য উপকৃত কৃষকের সংখ্যা আনুমানিক ৭০ লক্ষ। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১০ লক্ষ কৃষক প্রথম পর্যায়ে সরকারি পোর্টালে নিজের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করেছেন। তারা প্রতীক্ষা করে আছেন, কবে রাজ্য সরকার তাদের পরিবেশিত তথ্য মেলাবে এবং তা কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠাবে। কেন্দ্র নির্ধারিত টাকা তাদের ব্যাঙ্কে পাঠাবে। তাদের প্রতীক্ষাই সার হয়েছে। রাজ্য শামিল হয়নি কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে। আসলে এ রাজ্যে কারুরই সম্মান নেই। না শিক্ষক, না চিকিৎসক, না কৃষক।

এ বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল এই প্রকল্প চালুর বর্ষপূর্তি। এদিন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানিয়ে বলেছেন, দশ লক্ষ গরিব কৃষককে প্রথম পর্যায়ে বঞ্চিত করেছে রাজ্য সরকার।

গত ১০ আগস্ট রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় কৃষকের বঞ্চনার বিষয়টি ফের একবার তুলে ধরেন। তিনি ট্যুইট করে লেখেন, এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন, কেন এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষককে? মমতা সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতায় রাজ্য প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অনুভূতিহীন, সংঘাত-পিয়াসি রাজ্যের এ এক নিষ্ঠুর রসিকতা, এক ঐতিহাসিক অবিচার— এই তার অনুভব।

কৃষিমন্ত্রী তোমর এ ব্যাপারে রাজ্যকে দুটি চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন গরিব কৃষকের স্বার্থে প্রকল্প চালু করতে হবে। কিন্তু তবুও মন গলেনি রাজ্যের। চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সরকারি তরফে, অভিযোগ করেছেন তোমর। মমতা সরকার কৃষক উন্নয়নের এই টাকা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শ্রী তোমর জানিয়েছেন, এই টাকা গৃহীত হলে তা কেবল কৃষকের উন্নয়ন ঘটাতো তাই নয়, রাজ্যের অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করত। অর্থাৎ মমতা সরকার মুখ ঘুরিয়ে প্রকারান্তরে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথটিকেই বন্ধ করে দিলেন।

ভারতবর্ষের প্রায় ১৪ কোটি কৃষক এই সম্মান নিধি পাবার যোগ্য। এখনও পর্যন্ত ৯.৯৭ কোটি কৃষক টাকা পেয়েছেন। লক্ষ লক্ষ কৃষকের আধার কার্ড মেলানো বাকি, তাই তারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পিএম-কিষাণ প্রকল্পের মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক তথা কৃষি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বিবেক আগরওয়াল প্রকল্পের বিস্তারিত পরিসংখ্যান প্রদান করেছিলেন। pmkisan.gov.in— এই ওয়েবসাইটে বিস্তারিত পরিসংখ্যান ও তথ্য জানানো আছে।

বিগত ছয়টি দফায় এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা দেশব্যাপী বেড়েছে—

ডিসেম্বর-মার্চ ২০১৮-১৯ : ৩.১৬ কোটি
এপ্রিল-জুলাই ২০১৯-২০ : ৬.৬৩ কোটি
আগস্ট-নভেম্বর ২০১৯-২০ : ৮.৭৫ কোটি
ডিসেম্বর-মার্চ ২০১৯-২০ : ৮.৯৪ কোটি
এপ্রিল-জুলাই ২০২০-২১ : ১০.৪৬ কোটি
আগস্ট-নভেম্বর ২০২০-২১ : ৯.৮৪ কোটি

**পরিকল্পনাটি কী?**

পিএম কিষান একটি কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের পরিকল্পনা, যাতে ১০০ শতাংশ তহবিল ভারত সরকার দ্বারা প্রদত্ত। এর প্রায়োগিক সূত্রপাত ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর। পরিকল্পনার অঙ্গরূপে প্রতি বছর তিনটি

সমান কিস্তিতে মোট ছয় হাজার টাকা কৃষকের কাছে পৌঁছাবে। কৃষক হবেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, যাদের জমির মালিকানা সর্বোচ্চ দুই হেক্টর। এখানে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন শনাক্তকরণ করবে নিবন্ধীভুক্ত পরিবার এই পরিকল্পনায় সুবিধা পাবার যোগ্য কিনা। তহবিল সর্বদা সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে। পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে কারা কারা এই প্রকল্পে সুবিধা পাবেন না।

**এই প্রকল্পের সুযোগ পাবেন না কারা?**

উচ্চ আয়-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই স্কিমে টাকা পাবেন না। যেমন—

১. সকল প্রাতিষ্ঠানিক জমির মালিক।

২. কৃষক পরিবার যারা নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত।

ক. সাংবিধানিক পদ অলংকরণ করেছেন এমন ভূতপূর্ব অথবা বর্তমান ব্যক্তিত্ব।

খ. ভূতপূর্ব অথবা বর্তমান মন্ত্রী/রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভূতপূর্ব অথবা বর্তমান লোকসভা/রাজ্যসভা/বিধানসভা/বিধান পরিষদের সদস্য, ভূতপূর্ব অথবা বর্তমান মেয়র, ভূতপূর্ব অথবা বর্তমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ।

গ. কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ও কর্মী, সরকার অধিগৃহীত, স্থানীয় প্রশাসনের অথবা স্বশাসিত সংস্থার আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী, বহু-হুকুম তামিলকারী কর্মী ও গ্রুপ 'ডি' কর্মীদের অবশ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে প্রকল্প থেকে।

ঘ. অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী যাদের মাসিক পেনশনের পরিমাণ দশ হাজার টাকার বেশি।

ঙ. সমস্ত ব্যক্তি যারা শেষ অ্যাসেসমেন্ট বর্ষে ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছিলেন।

চ. পেশাদারী ব্যক্তিত্ব যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, সৌধ নির্মাণ বিশেষজ্ঞ প্রমুখ।

রাজ্য ও দেশব্যাপী প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তিনি পিএম-কিষাণ ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে শামিল করতে আগ্রহী, যদি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তরিত হয় এবং আয়ুষ্মান প্রকল্পের ১০০ শতাংশ তহবিলই কেন্দ্র প্রদান করে। এর পরেই শুরু হয়ে যায় রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কথার দ্বৈরথ। গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় প্রশ্ন তোলেন, পিএম-কিষাণ তহবিল স্থানান্তরে কেন্দ্র সরকার ও কৃষকের মধ্যে কেন রাজ্য মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে চাইছে? মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে সংবিধানের ম্যানডেটের মধ্যে থাকার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখার একদিন পরেই রাজ্যপালের এই প্রশ্ন তোলা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীধনখড় প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছেন। ধনখড় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, তিনি যেন প্রস্তাবটি রাজ্য ক্যাবিনেটে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রত্যাবর্তন পদক্ষেপ আখ্যায়িত হয়েছে দুর্নীতির প্লাবনক্ষেত্র রূপে, যা আছড়ে পড়বে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, এমনই আশঙ্কা। শ্রীধনখড় আশা প্রকাশ করেছেন এখন কৃষককে পরিচ্ছন্ন ও নান্দনিক পরিবেশ দেবার সময় আসন্ন। আম্ফান ঝড়ের ত্রাণের সময়, কোভিড পরিস্থিতিতে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের বিপুল দুর্নীতি প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যবাসী। বর্তমানের জাতীয় নীতি হচ্ছে 'Minimum government, maximum governance' 'ন্যূনতম সরকার এবং সর্বাধিক পরিষেবা'। তবে মমতার সরকার কেন চাইছে, সর্বাধিক সরকার এবং ন্যূনতম পরিষেবা ও প্রশাসন ? বরং কেন্দ্র যে অবিরাম, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ এবং সরাসরি তহবিল স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছে পিএম-কিষাণ প্রকল্পে, তার মধ্যে কেন অযথা আসতে চাইছে রাজ্য সরকার? যে প্রকল্প সারা দেশ জুড়ে সুনাম কুড়িয়েছে, মানুষের সহায়তা লাভ করেছে, কেবল পশ্চিমবঙ্গে এসেই তার উপস্থিতি বেমালুম উধাও। এ পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি গরিব কৃষক বারো হাজার টাকা এবং সব মিলিয়ে আট হাজার চারশো কোটি টাকার বঞ্চনা পেয়েছেন। শ্রী ধনখড় উল্লেখ করেছেন, পিএম-কিষানের ফলে রাজ্যের কৃষকেরা আরও তিরিশ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ পেয়ে উপকৃত হতে পারতেন। কারণ করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের তরফে দেশব্যাপী ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজও ফার্ম সেক্টরে ঘোষণা করা হয়।

এখন প্রশ্ন, তৃণমূল সরকার কেন এই প্রকল্প এখন শুরু করার বার্তা দিচ্ছে? কারণ নির্বাচন আসন্ন। সরকারের জনপ্রিয়তা একদম তলানিতে। কৃষিবিলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে লাভ হয়নি শাসকদলের। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নানান শাখা সংগঠন এবং অরাজনৈতিক বহু সংগঠনের জোর প্রচেষ্টায় বাঙ্গলার মানুষ বুঝতে পেরে গেছেন, দালালি শক্তির রমরমা থেকে বাজারকে বের করে আনতে চাইছে কেন্দ্র, বাদ সাজছে মধ্যস্বত্বভোগীদের রাজনৈতিক দল। যাদের স্বার্থে আঘাত লাগছে, তারাই বিলের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এমতাবস্থায় কৃষক-বান্ধব এই সম্মান নিধি প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলে এই সরকার কৃষক বিরোধী সরকার এটাই প্রমাণিত হবে। তার থেকে বেরিয়ে আসার একটা সম্মানজনক পথ খুঁজছে শাসকদল। যদি কেন্দ্র রাজ্যের শর্তে অনুমোদন না দেয়, তবুও বলতে পারবে চেষ্টা করা হয়েছে, রাজ্যকে মধ্যস্থতার অনুমতি দেয়নি কেন্দ্র। এটা অগণতান্ত্রিক। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০১১-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে যদি কোনোভাবে কেন্দ্র মেনে নেয় রাজ্যের দেওয়া শর্ত ও মধ্যস্থতা, তবে রাজ্যপাল আশঙ্কিত দুর্নীতির সুযোগ থেকে যাচ্ছে, ওটাই রসদ বহু লোভী দলীয় কর্মীর। তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষ অনেক সময় বোঝেন না, টাকাটা কে দিচ্ছে, রাজ্য না কেন্দ্র? পাড়া-মহল্লায় অথবা গ্রামে যে ত্রাসসৃষ্টিকারী নেতাকে দেখেন, তাদের হৈ-চৈ হুল্লোড়ের দান মনে করে, ভাগ দিয়ে ঝামেলা মেটান। ▯

# দিল্লিতে কৃষক-আন্দোলনের নামে যা হচ্ছে, তা কৃষকের নয়

কেন্দ্রের কৃষি বিলের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'কৃষিজীবী'রা পথে নেমেছেন। তাঁদের দপটে রাজধানী দিল্লি নাকি অবরুদ্ধ। খবরের কাগজ বা টিভিতে চোখ না রাখলেও চলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ বোলালে মনে হবে, 'কৃষক বিদ্রোহে'র অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভারত এবং মোদী সরকারের মূলোৎপাটন করতে পারলেই তাদের ষোলকলা পূর্ণ হবে! সেইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু চিত্র, যেমন হাতরাসকাণ্ডে যে মহিলা, 'ভাবী'র পরিচয়ে সংবাদমাধ্যম তোলপাড় করেছিলেন তাঁকেই এই কৃষক আন্দোলনে নতুন অবতারে অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। এনআরসি-বিক্ষোভের পরিচিত মুখেও পাগড়ি এঁটে কৃষি বিলের প্রতিবাদ-রত, এমন দৃশ্যও সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এই সন্দেহ দানা বাঁধছে যে, এই তথাকথিত কৃষক-আন্দোলনে প্রকৃত কৃষিজীবী মানুষ আদৌ অংশ নিয়েছেন তো?

**কেন্দ্রের কৃষিবিল একান্তই কৃষকের স্বার্থে, তবে রাজনীতির স্বার্থান্বেষী ফড়েদের এতে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই কৃষকের নাম ভাঙিয়ে আন্দোলনের এই মহড়া।**

এই প্রশ্নের মীমাংসার আগে দেখা দরকার কেন এই আন্দোলন হলো? এর নেপথ্যে রয়েছে, কেন্দ্রের তিনটি পৃথক কৃষি বিল। প্রথমটি হলো, 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন', দ্বিতীয়টি, 'কৃষি পণ্য লেনদেন ও বাণিজ্য উন্নয়ন', তৃতীয়টি হলো 'কৃষিপণ্যের মূল্য-নিশ্চিতকরণ কৃষক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন চুক্তি' বিল। তিনটি বিলই কৃষক-মুখী ও আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে স্বনির্ভর কৃষিজীবী গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি। বিলগুলি সংসদের নিম্নকক্ষে অর্থাৎ লোকসভায় আগেই পাশ হয়েছিল। গত ২৯ নভেম্বর বিরোধীদের সম্মিলিত প্রতিরোধ সত্ত্বেও সরকার সংসদের উচ্চকক্ষে রাজ্যসভায় তিনটি বিলের মধ্যে অন্তত দুটি পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

এবারেই আসল প্রশ্নটা আসছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে স্বীকৃত। এখন বিরোধীরা

বলছেন, ভারতে গণতন্ত্র নেই। কথাটা বিচার করে দেখা যাক। এই গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই কেন্দ্র এই ধরনের কৃষিবিল পাশ করিয়ে নিতে পেরেছে। মোদী সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে একটা প্রবণতা ছিল সংখ্যাধিক্যের জোরে কোনও বিল লোকসভায় সরকার পাশ করিয়ে নিলেও বিরোধীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা আটকে যাচ্ছিল রাজ্যসভায়। এই প্রবণতার জন্য মোদী সরকারের প্রথম চার-সাড়ে চার বছরে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদীয় আইনে পরিণত হয়নি।

তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় জনগণের দ্বারা অনির্বাচিতরা নির্বাচিতদের পাশ করা বিলও নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এনডিএ সরকার অসীম ধৈর্য নিয়ে বিজেপি-সহ শরিক দলের বিধানসভা ভোটগুলিতে ভালো ফল করার অপেক্ষা করছে। তারপর রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে। কিন্তু ইদানীং বিরোধীদের মধ্যে যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সময়ও দেখা গিয়েছিল, এখনো সেই ঘটনার অ্যাকশান রিপ্লে হচ্ছে সংসদের দুই কক্ষেই হেরে গিয়ে, এমনকী এবার এনডিএ শরিক ভাঙিয়েও কোনো সুবিধা হয়নি; বিরোধীরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বাইরে নানারকম গা-জোয়ারি করছেন, যেমন রাজধানী অচল করে দেওয়া ইত্যাদি। একটা কথা মাথায় রাখা দরকার, দিল্লিতে এই মুহূর্তে করোনা পরিস্থিতি খুব ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও ধরনের জমায়েত এই সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

কিন্তু নিজেদের এই অগণতান্ত্রিক মনোভাব থেকে মুখ-লুকানোর জন্য 'মাত্র দুশো জনের মধ্যে কে দেশে থাকবে আর কে থাকবে না নির্ধারণ করতে পারে না' এই তত্ত্ব যেমন নাগরিকত্ব আইনের সময় খাড়া করা হয়েছিল, এখন যে সাংসদরা চাষ করেন না, তাঁরা কৃষির কী বুঝবেন গোছের অপযুক্তি খাড়া করা হচ্ছে।

গণতন্ত্রের পরিস্থিতিটা কোথায় পৌঁছে গিয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায় সবরকম গণতান্ত্রিক পথে বিরোধীদের পরাস্ত করা সত্ত্বেও মোদী সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতে চেয়েছে, এমনকী তাদের কাছে খাবারও পৌঁছে দিয়েছে। আর তাতেই বিরোধীদের মুখোশ খুলে গেছে।

আন্দোলনকারীরা কোনওমতেই আলোচনায় যেতে রাজি নন, সরকারের দেওয়া খাদ্য ফিরিয়েও তাঁরা বীরত্ব দেখাচ্ছেন। তাঁদের আসল উদ্দেশ্যটা এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে— গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁরা এঁটে উঠতে পারছেন না বলেই ঘুরপথে ভারতবর্ষকে অশান্ত করতে চাইছেন। তাদের এই অসদুদ্দেশ্য আড়ালের জন্যই 'মোদী সরকারের আমলে দেশে গণতন্ত্র নেই' এমন ধুয়া তুলছেন। এদের উদ্দেশ্য দেশে যেনতেন প্রকারেণ অশান্তি জিইয়ে রাখা। করোনা পরিস্থিতির আগে নাগরিকত্ব আইন নিয়েও একই ধ্যাষ্টামি চলেছিল, সেই পরিস্থিতি এখন থিতিয়ে যেতে কৃষি বিলকে টার্গেট করা হয়েছে। মাঝে মোদী সরকারের শিক্ষা-নীতি নিয়েও একই হুজুগ তোলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ লোকে শিক্ষার চেয়ে কৃষি বেশি 'খায়' বলে কৃষিকেই মূল টার্গেট করা হয়েছে। আসলে ভোটে হারার অজুহাত এরা সর্বদাই মজুত করে রেখেছিল— 'ইভিএম হ্যাক হয়েছে', এখন সাধারণ ভোটাররা বুঝে গেছেন বিজেপি জিতলেই 'ইভিএম হ্যাক', আর বিরোধীরা জিতলে সেটা 'জনগণের রায়' এই তত্ত্বের পেছনে বিরোধীদের দেশের গণতন্ত্রকে অস্বীকার করার ইন্ধন আছে। একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের দ্বারা প্রচারিত এই তথাকথিত 'কৃষক-সংগ্রাম'কে কোনও কোনও বিশেষ প্রচারমাধ্যম বিকৃত ছবি দেখিয়ে 'জওয়ান বনাম কিষান' আখ্যা দিয়ে দেশ-বিরোধী মনোভাব কিংবা কৃষকদের 'অন্নদাতা' হিসেবে দেখিয়ে জনগণের সেন্টিমেন্ট তৈরি করতে চাইছে। কৃষকরা আমাদের পাতে ভাত তুলে দেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু এই আন্দোলন যে কৃষকের নয়, বরং রাজনীতির কারবারিদের তা ঘটনাক্রম থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের কৃষিবিল একান্তই কৃষকের স্বার্থে, তবে রাজনীতির স্বার্থান্বেষী ফড়েদের এতে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই কৃষকের নাম ভাঙিয়ে আন্দোলনের এই মহড়া। ▫

*With Best Compliments form :*

A
Well
Wisher

# ভারতের অর্থনীতি পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের দিকে

*ভারত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আহ্বান জানাচ্ছে। দেশ শুধু উন্নয়নের পথে এগোনোতেই বিশ্বাস করে না, একই সঙ্গে ইএসজি ক্ষেত্রকেও গুরুত্ব দেয়। ভারতের গণতন্ত্র, জনবিন্যাস, চাহিদা এবং বৈচিত্র আকর্ষণীয়।*

২০২৪ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য অর্থনীতিতে পরিণত করতে সরকার আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভার্চুয়াল রাউন্ড টেবিল বৈঠক (ভিজিআইআর)-এ শীর্ষস্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ভারতীয় বাণিজ্য জগতের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ, সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক এবং আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে আলোচনার সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে।

ভিজিআইআর-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারত উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। পরিবেশ, সমাজ ও প্রশাসন (ইএসজি)-৩টি ক্ষেত্রকেই দেশ সমান গুরুত্ব দেয়। এদেশের গণতন্ত্র, জনবিন্যাস, চাহিদা এবং বৈচিত্র্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে তাঁর এবং নতুন ভারতের পরিকল্পনার কথা শুধুই বলেননি, তিনি এদেশে বিনিয়োগের জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ভিজিআইআর ২০২০-তে ভারতের অর্থনৈতিক এবং বিনিয়োগের চিত্র, গঠনগত সংস্কার এবং ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য অর্থনীতির জন্য সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে বিশ্বের বৃহত্তম ২০টি পেনশন ও সোভেরিন ওয়েলথ ফান্ডের বিনিয়োগকারীরা অংশ নিয়েছিলেন--- যাঁদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। এই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রথম সরকারের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

**প্রধানমন্ত্রী বলেছেন**

● আমরা নতুন একটি ভারত গড়ে তুলছি, যেখানে সমস্যাসঙ্কুল পুরোনো অভ্যাসগুলিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থিতিশীল সমাধানের জন্য ভারত কাজ করছে।

● আপনারা যদি নিশ্চিতভাবে লভ্যাংশ ফেরত চান, গণতন্ত্র দাবি করেন, স্থিতিশীলতার সঙ্গে স্থায়িত্ব এবং পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন চান, ভারতই হলো সেই জায়গা।

● ভারত বিশ্বে বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠেছে, এর কারণ আমাদের নীতিগুলিতে স্থায়িত্ব রয়েছে।

● গত বছরের তুলনায় এবছর শেষ ৫ মাসে এফডিআই বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ শতাংশ।

● এর মূল কারণ আমাদের শক্তিশালী ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আমরা ৮০ কোটি মানুষকে খাদ্যশস্য বণ্টন করেছি, ৪২ কোটি মানুষের কাছে টাকা পাঠিয়েছি এবং ৮ কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস দিয়েছি।

● জাতীয় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দেড় লক্ষ কোটি বিনিয়োগের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে মাল্টিমডেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত হয়েছে। দেশ জুড়ে মহাসড়ক, রেলপথ, মেট্রোরেল, জলপথ ও বিমানবন্দর গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে।

● ভারতের কৃষকদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সুযোগ করে দিতে কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রতি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি এবং আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভারত শীঘ্রই কৃষিক্ষেত্রে রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

● জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাস খোলার সুযোগ তৈরি হবে। ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ মিশন আর্থিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে।

**সরকারি উদ্যোগ**

● ২০১৪-২০ সালের মধ্যে ২০০৮-১৪ সালের হিসেবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৮-১৪ সালে যেখানে এফডিআই-এর পরিমাণ ছিল ২৩.১৩৭ কোটি ডলার সেখানে ২০১৪-২০-র মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫,৮২১ কোটি ডলার।

● রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় ১০ শতাংশ এফডিআই বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬,০০০ কোটি ডলার। এই বৃদ্ধির চালিকাশক্তি ভারত।

● সহজে ব্যবসা করার তালিকায় ভারতের স্থান ৬৩। ২০১৪ সালে এই স্থান ছিল ১৪২।

● এ বছরের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৩৫৭৩ কোটি ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। যে কোনো অর্থবর্ষের প্রথম ৫ মাসের হিসেবে যা সর্বোচ্চ।

**প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা অর্জন হয়েছে :**

বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতে এর পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। দেশে উৎপাদন বাড়াতে সরকার, শিল্প করিডর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং প্রকল্প উন্নয়ন সেল তৈরি করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিচ্ছে।

**প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য অর্থনীতিতে পৌঁছতে পারবে :**

কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে অর্থনীতি এবং উন্নয়ন ব্যহত হলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আশাবাদী যে ভারত ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য অর্থনীতিতে পরিণত হবে। একটি ইংরেজি দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যদিও এবছর উন্নয়ন মহামারীর কারণে কাঙ্ক্ষিতভাবে হয়নি, কিন্তু আগামী বছর দেশ চেষ্টা করবে এই ক্ষতি পূরণের জন্য দ্রুতভাবে এগোতে। ক্রয় ক্ষমতার নিরিখে ভারতে বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। —'আমরা চাই বর্তমান মার্কিন ডলারের মূল্যের হিসেবেও ভারত, তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠুক। ৫ লক্ষ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রা আমাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব দিক বিবেচনা করছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গ্রামে পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করেছি, আমরা নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ করেছি। এমনকী আমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ৮ কোটি উজ্জ্বলা সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছি, তাই আমাদের ট্রাক রেকর্ড এবং সংস্কারমুখী উদ্যোগের কারণে বলা যায়, আমাদের লক্ষ্য অর্জনে জনসাধারণের আস্থা রয়েছে।'

**পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের নিরিখে প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় ভারত এগিয়ে :**

প্রধানমন্ত্রী ওই সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০২০ সালে ভারতে ১৫৪টি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প এসেছে। চীনে এই সময়ে ৮৬টি, ভিয়েতনামে ১২টি এবং মালেশিয়ায় ১৫টি প্রকল্প এসেছে। ভারতের উন্নয়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আস্থা এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।

**কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত উদ্যোগ :**

কোভিড-১৯ মহামারীর মোকাবিলায় প্রাথমিক স্তরে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়ায় একে আটকানোর জন্য সরকারের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধে হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। কোভিড-১৯-এর কারণে মৃত্যুর হার বিশ্বের নিরিখে ভারতে সর্বনিম্ন। গত কয়েক মাস ধরে ইতিবাচক শিক্ষা লাভের ফলে সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নতি হয়েছে। দেশের দূরতম প্রান্তে পৌঁছানো গেছে। প্রথমবারের মতো সরকার, এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যার ফলে শতাব্দীর মধ্যে ১ বার দেখা দেওয়া এধরনের মহামারীকে আটকাতে সুবিধা হয়েছে।

*(আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের ভার্চুয়াল রাউন্ড টেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য)*

# সম্মান খুইয়ে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকরা শাসকদলের ভোট প্রচারে

**বিশ্বপ্রিয় দাস**

'চলুন মাস্টারমশাই ঘুরি বাড়ি বাড়ি' ---সেই নির্লজ্জ পদক্ষেপ। শিক্ষকরা চলেছেন সরাসরি শাসক দলের হয়ে ভোট চাইতে। যদি ধরে নেওয়া হয় শাসক দলের সদস্য এরা, তবুও সেই বামেদের দেখানো নির্লজ্জ পথের অনুসরণ করতে হচ্ছে রাজ্যের শাসক দলকে। কী বলছেন শিক্ষকরা দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে? রাজ্যের শাসক দলের নানা প্রকল্পের স্তুতি গাইছেন তাঁরা। অনেকটা ডোর-টু-ডোর সেলসম্যানের পর্যায়ে নেমে গেলেন শিক্ষকরা। বিশেষ করে রাজ্যের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা। কেননা এই অভিযানে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের খুব একটা দেখা মিলছে না। একটি সূত্র বলছে, ওদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা রাজ্যের শাসক দলের নেই। এখনো ওরা সেই বাম শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গেই রয়েছেন সিংহ ভাগ। তাই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো লাথি-ঝ্যাটা খাওয়া প্রাথমিক শিক্ষকরাই শাসকের ভরসা।

প্রাথমিক শিক্ষকদের হাল কেমন, একটু দেখে নেওয়া যাক। তাঁদের বেতন বৈষম্য আর বলার নয়। একই পদে কিন্তু মাদ্রাসার থেকে বেতনের দিক দিয়ে বিশ যোজন দূরে। যোগ্যতার মাপকাঠিতে দেওয়া হয় না বেতন। দেওয়া হয় না অন্য সব সরকারি সুযোগ সুবিধাও। অথচ তাঁরাই স্কুলের জন্য নিবেদিত প্রাণ। প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেও, তাঁরা পান না বেতন কাঠামোর সুবিধা। বাম আমলে ছিল এক ধরনের বঞ্চনা। সেই সময়েও পরোক্ষ একটা হুমকির সামনে সব ধরনের কাজ করতে হতো এই সব প্রাথমিক শিক্ষকদের।

বেশ কয়েক আগের ঘটনা, সল্টলেকে নিজেদের জন্য আন্দোলনে নেমেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকরা, সেই আন্দোলনে কী হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের দৌলতে তা সবাই জানেন। এমনকী নজরুল মঞ্চের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রীর উক্তিও মনে আছে প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে, এই প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মান দেবার কথা বারে বারে বলেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর একেবারেই ভুলে গেছেন সব।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম মোতাবেক প্রতিটি শিক্ষককে চাকরি বাঁচাবার তাগিদে উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ, সঙ্গে ডিইএল যোগ করতে হলো। তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া গেল যে সরকারি সাহায্যেই অনেকে এই যোগ্যতা মান পেরোলেন। এরপর তাঁরা কি পেলেন তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন? সেই দাবি এখন আর কেউ ভয়ে জানাতে চায় না। একটা হিটলারি ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায়। একজন প্রাথমিক শিক্ষককে পড়াতে হচ্ছে সেই প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী। এখানে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের স্পেশালাইজড সাবজেক্ট টিচার প্রথা নেই। ফলে সব বিষয় তাঁদের পড়াতে হয়। অথচ বেতনের বেলায় যা দেওয়া হয়, সেটা কী যোগ্যতামান না কাজের নিরিখে। একজন প্রাথমিক শিক্ষক একটুও বিশ্রাম পান না স্কুল চলাকালীন। কেননা, ক্লাস অনুযায়ী শিক্ষক। গ্যাপ নামক শব্দটা পাওয়া যায় না। আবার প্রাথমিকের শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের একাধারে কেয়ার টেকার, বাথরুম পরিষ্কার, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখী করার জন্য মহল্লায় মহল্লায় ঘোরা, ভোটের কাজ, সেন্সাসের কাজ সমেত বহু কাজ করতে হয়—সঙ্গে আছে করণিকের কাজও।

ফিরে আসা যাক আগের কথায়। শিক্ষকরা চলেছেন প্রচারে। শিক্ষকরা নিজেদের বঞ্চনার ব্যথা বুকে চেপে রেখেই চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বুকে চেপে ধরে।

গত সাত বছরে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যেও চালু হয়েছে অলিখিত একটা সিন্ডিকেট। যেখানে বদলি থেকে পেন্সন ফাইল মুভমেন্ট, ছুটি থেকে নানা সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে চালু হয়েছে নজরানা দেবার প্রথাও। সেটি শাসক দলের যে ইউনিয়ন রয়েছে, তাঁদের সদস্যদের অনেকের কাছেই কান পাতলেই শুনতে পাবেন সবাই।

গত ১০ বছরে প্রাথমিক শিক্ষকরা শুধুই বঞ্চনার শিকার। বাম আমলে যে অবস্থায় ছিলেন তাঁরা, যে চাপের কাছে নতি স্বীকার করে চলতে হয়েছে, এই ১০ বছরে সেটি বেড়েছে কয়েক গুণ। তবুও প্রায় মরা (প্রাথমিক) শিক্ষকরা যাবেন সরকারের গুণগান গাইতে, দরজায় দরজায়। □

# গোরু-পাচার আটকানো যাচ্ছে না তবে কি সরষের মধ্যেই ভূত?

**নিজস্ব সংবাদদাতা ॥** ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রায় দিন অবাধে গবাদিপশু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। এ কথায় বলা যায় যে গবাদিপশু-সহ বিভিন্ন নেশার সামগ্রী পাচারের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে সীমান্ত এলাকাগুলি।

প্রকাশ থাকে যে, লকডাউন ও করোনার আবহে পাচারচক্রের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এদিকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর দাবি যে, তাঁরা চোরাকারবার রোধে সবরকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে তথ্যাভিজ্ঞ মতে, গবাদিপশু-সহ বিভিন্ন নেশার সামগ্রীও নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের পাশাপাশি নামি-দামি কোম্পানির মোবাইল ফোন, জিরা ও প্রসাধনী সামগ্রীর পাচার বেড়েছে ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাগুলি দিয়ে।

প্রকাশ যে, পুলিশ ও বিএসএফকে আড়ালে রেখে পাচারকারীরা অবাধে বাংলাদেশে পাচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী কিছু লোকের মতে, সীমান্ত এলাকায় মাল পৌঁছে যাওয়ার পর কিছু নির্দিষ্ট ঠেকেই মালগুলি রাখা হয়। সন্ধ্যে হলেই পাচারকারীরা সীমান্তে প্রহরারত বাহিনীর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করে এবং ফাঁক পেলেই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছপা হন না। এইসব মাল মুহূর্তেই বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। সীমান্তে প্রায় সারারাত ধরে এমন কার্যকলাপ চালায় পাচারকারীরা বলে জানা গেছে। কিছু ক্ষেত্রে বিএসএফ ও পাচারাকারীদের গোপন আঁতাতের খবরও এলাকায় চাউর হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় এমন গোপন আঁতাতকে লাইন বলে বলা হয়। এই গোপন আঁতাত বাবদ সংগৃহীত অর্থকে লাইনের টাকা বা চুঙ্গি বলা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, লকডাউনের মধ্যে সবজির গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স বা ছোটো গাড়িতে বিভিন্ন নেশার সামগ্রী যেমন— গাঁজা, হেরোইন বা নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ-সহ অন্যান্য নেশার সামগ্রী সবজির গাড়িতে লুকিয়ে রাখত। এসব কাজে বর্তমানে পড়াশোনা বন্ধ থাকায় এবং সংসারের হাল ধরতে সীমান্ত এলাকায় কিছু পড়ুয়া ও যুবকরাও এই অবৈধ কাজে ঝুঁকে পড়েছে। এরা অনেকেই সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

বিশেষ এক সূত্রের খবর, সীমান্তের এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত শাসকদলের দুই বা ততধিক নেতা। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন মহলের যোগসাজশ থাকায় এনাদের কাছে গিয়ে মাসিক চুক্তি বা অবৈধ মালের ওপর লাইন বা চুঙ্গি দিলেই ছাড়পত্র মিলে যায়। কিন্তু ওই লাইন বা চুঙ্গি আদায় করা ও এর ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দলের অন্দরে কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের অপ্রকাশিত গোষ্ঠী কোন্দল দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে সীমান্তবর্তী এলাকায় বলে জানা গেছে। এই গোষ্ঠী কোন্দলের সুযোগ বিরোধী দলেরা ভোটের প্রাক্কালে কাজে লাগানোর চেষ্টায় আছেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, লকডাউন সীমান্তে কড়া নজরদারি রয়েছে এবং চোরাকারবার রোধে বিএসএফ অবিরত সীমান্তে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও পাচাররোধে সীমান্তবাসীর সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখে বিএসএফ। সীমান্তবাসীর মতে, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পাচারের সময় অনেক সময়ই হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং অনেক মাল উদ্ধার করে এবং অনেক সময় পাচারও রুখে দেয়।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, গবাদিপশু-সহ অন্যান্য অবৈধ মালগুলি পাচারকারীদের কেরিয়াররা সীমান্তে পৌঁছানোর আগে পুলিশ তাদের আটকাতে পারে না কেন? তবে কি এই পাচার চক্রের পাণ্ডাদের চ্যানেলে অনেকেরই যোগ আছে? আরও এ প্রশ্নও উঠেছে, তবে কী যে সরিষার মধ্যেই ভূত আছে?

# অবশিষ্ট বিশ্বে প্রভাব বিস্তারে চীন এখন বেপরোয়া : মোহন ভাগবত

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** 'চীন মুখে বলে সমাজতন্ত্র তাদের আদর্শ এবং একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ কখনই সাম্রাজ্য বিস্তারের ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয় না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের আদর্শকেই অনুসরণ করছে চীন।' সম্প্রতি একথা বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আয়োজিত 'বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের ভূমিকা' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রে বক্তব্য পেশ করার সময় মোহন ভাগবত বলেন আমেরিকার সুসংহত বিশ্ব গড়ার চেষ্টা সত্ত্বেও, বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং চীন সুকৌশলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'চীন এখন মাথা তুলেছে। এটাই চীন চেয়েছিল। কমিউনিস্টরা বলে থাকেন, তারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। সেই জন্যেই তারা পুঁজিবাদকে কখনও গ্রহণ করবেন না এবং সাম্রাজ্যবাদের ভাবনাকেও প্রশ্রয় দেবেন না। শ্রীগুরুজী (সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক এমএস গোয়ালকার) ষাটের দশকে বলতেন, কমিউনিস্টরা মুখে যা বলে তা কোনওদিনই হবে না। তিনি বলতেন, কিছুদিন অপেক্ষা করো, চীনের আসল রূপটি দেখতে পারে। চীন কনফুসিয়াসের আদর্শ গ্রহণ করেনি। বরং চীনের প্রাচীন সম্রাটদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিই বর্তমান চীনের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। যার প্রমাণ আমরা এখন পাচ্ছি। আজকের চীন সারা বিশ্বের নিরিখে একটি বিরাট অর্থনৈতিক শক্তি এবং যে কোনও মূল্যে সে সারা বিশ্বে তার প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এ ব্যাপারে বিশ্বের অন্যান্য দেশ কে কী বলল তাতে তার কিছুই যায় আসে না।

সরসঙ্ঘচালক মনে করিয়ে দেন এখন ভারত আগের থেকে অনেক শক্তিশালী। সব থেকে বড়ো কথা আজকের ভারত তার শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনও। তিনি বলেন, 'ভারত চিরকালই শক্তিশালী ছিল কিন্তু শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা ছিল না। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় সারা বিশ্বে ভারত সম্বন্ধে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছিল। চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বারবার আমেরিকার কাছে দরবার করত বলে ভারতকে বলা হতো ঘ্যানঘেনে বাচ্চা। সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই। তবে

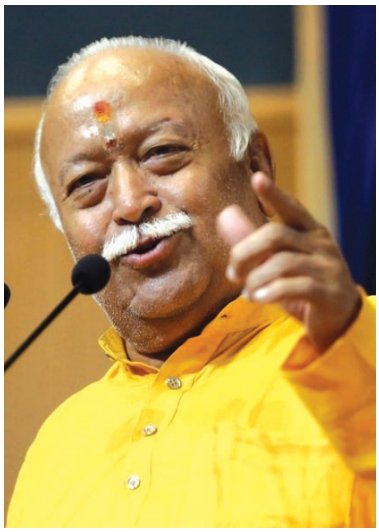

তার মানে এই নয় যে শক্তিগর্বে মত্ত হয়ে ভারত গুণ্ডামি করে বেড়াবে। আমরা শক্তিশালী হলে দুর্বলকে রক্ষা করব। আমরা যদি ধনী হই বিশ্বকল্যাণে ব্রতী হব। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার যে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই সেকথা উল্লেখ করে মোহন ভাগবত বলেন, 'বহুকেন্দ্রিক বিশ্বে রাশিয়াও তার খেলা শুরু করেছে। পশ্চিমি বিশ্বকে দাবিয়ে রেখে রাশিয়া একা মাথা তুলতে চায়। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তর গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদ আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে।

সারা বিশ্বে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'উদার গণতন্ত্র বলে একটি তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জাতীয়তাবাদের ধারণা একটি ভ্রান্ত ধারণা— সারা বিশ্বই এক। এটা একটা ভালো ভাবনা। কিন্তু যেসব দেশে উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তারাই এখন জাতীয়তাবাদের পক্ষে সওয়াল করছে। ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড— সব জায়গায় একই অবস্থা। সুতরাং বাজারের প্রয়োজনে সারা বিশ্বকে এক করার তত্ত্ব মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে।

মোহন ভাগবত আরও বলেন, 'পৃথিবীর তথাকথিত শক্তিধর দেশগুলিকে মানুষ ভয় পায়। তারা এইসব দেশকে বিশ্বাস করেন না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানুষ বিশ্বাস করেন যে ভারত যদি নেতৃত্ব দেয় তাহলে সকলেই উপকৃত হবে।'

# করোনাকালে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে উত্তর দিনাজপুরের গ্রন্থাগারগুলির বইপত্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা॥** উত্তর দিনাজপুর জেলায় করোনার আবহে দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমস্যায় জর্জরিত বহু গ্রন্থাগার। গত মার্চ মাস থেকে লকডাউনের শুরু থেকেই উপরোক্ত গ্রন্থাগারগুলি বন্ধ রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, উত্তর দিনাজপুর জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা মোট ৫৪টি। তার মধ্যে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৫০টি ও ৪টি টাউন লাইব্রেরি তার মধ্যে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার এবং ইসলামপুর মহকুমা। এতে গ্রন্থাগারিক রয়েছেন মোট ৩১ জন। আবার এসব গ্রন্থাগারিক একাধিক গ্রন্থগারের দায়িত্বে রয়েছেন। জেলার পাঠকদের একাংশ এই প্রশ্ন তুলেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা গ্রন্থাগারগুলির কেমন রয়েছে তাক ও আলমারিতে ঠাসা বইগুলি। জেলার এক মহলের মতে, করোনার আবহে গ্রন্থাগারগুলি বন্ধ থাকায়, বহু বই নষ্টের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে জেলা গ্রন্থাগারিকের বক্তব্য, করোনা পরিস্থিতিতে গ্রন্থগার চালু করা যাচ্ছে না। তবে কর্মী ও পরিচালন সমিতির লোকজন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থাগারগুলির বই ন্যাপথলিন দিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অপরদিকে জেলার এক গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির সদস্যের বক্তব্য যে, কয়েক মাস ধরে গ্রন্থাগারের দরজা জানালা বন্ধ থাকায় হাওয়া-বাতাস ঢুকছে না। আর আগের মতো রাসায়নিক দিয়ে বই সংরক্ষণ করা দূর, গ্রন্থাগারে ঝাড়পোছও হচ্ছে না। এই কারণে বিপুল সংখ্যক বই নষ্টের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত একাংশের বক্তব্য এই যে, পাঠকেরা বই নেড়ে চেড়ে দেখেন এবং সেগুলি বাড়িতেও নিয়ে যান। তাতে করে বই ভালো থাকে। এতে ঘনঘন হাত বদলও হয়। এছাড়া গ্রন্থাগারের কর্মীরা এইসব বইগুলি পরিষ্কারও করেন এবং পুরনো বইগুলি রাসায়নিক দিয়ে ভালো রাখার চেষ্টাও করা হয়।

তবে অল্পসংখ্যক কর্মীরা এ অভিযোগ তুলেছেন যে, টাকা এবং পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোর অভাবে এসব কাজ ভালো ভাবে হয় না। আর লকডাউন পরিস্থিতিতে সেটুকুও যে হচ্ছে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ জেলার কর্মী ও পাঠকদের একাংশের বক্তব্য যে, যেখানে ট্রেন, বাজার, রাজনৈতিক দলের সমাবেশ এবং জলসাও চলছে, সেখানে গ্রন্থাগার খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না কেন? বই বাঁচাতে করোনা বিধি মেনে গ্রন্থাগার খোলার অনুমতি দেওয়া হোক বলে অনেকের মত। কিন্তু জেলার এক গ্রন্থাগারিকের কথায়, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেমন নির্দেশ দেবেন, সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে'। এ ব্যাপারে শাসক দলের গ্রন্থাগার মন্ত্রীর কোনো হেনদোল নেই।


বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

# মুসলমান ভোট মেরুকরণ চলবে, হিন্দু ভোট চলবে না

**আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেন, আমার গলায় ছুরি ধরলেও আমি 'ভারতমাতা কী জয়' বলব না, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেবো না। এই সেই আসাদুদ্দিন ওয়েইসি যার সভা থেকে ধ্বনি উঠেছিল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।**

**মনোরঞ্জন জোয়ারদার**

পশ্চিমবঙ্গে ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচন। দ্রুত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল ঘটছে। প্রত্যেকদিন রাজনৈতিক সমীকরণ পালটাচ্ছে। কিন্তু এই বদলে যাওয়া রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে বিশেষভাবে চর্চা হচ্ছে তা হলো এ আইএমআইএম নামে রাজনৈতিক দলটির উপস্থিতি। এআইএমআইএম অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন, সংক্ষেপে মিম। এই দলটির নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি চারবারের লোকসভার সদস্য। এই সেই ওয়েইসি যিনি উগ্র ভাষণের দ্বারা কেবল মুসলিম অধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকেন, খোদাতালা ও কোরান-হাদিসে ভরসা রাখতে বলেন। যিনি বলেন, আমার গলায় ছুরি ধরলেও আমি 'ভারতমাতা কী জয়' বলব না, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেবো না। এই সেই আসাদুদ্দিন ওয়েইসি যার সভা থেকে ধ্বনি উঠেছিল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। এই আসাদুদ্দিন তার মিম দল নিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসছেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তিনি প্রার্থী দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

মিম নির্বাচন কমিশন স্বীকৃতি দল। প্রার্থী দিতেই পারে। কিন্তু এই দলটির পূর্বাপর ইতিহাস আমাদের একটু জানা দরকার। মিম দল বা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬-২৭ সাল নাগাদ। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদে এটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মোহাম্মদ নওয়াজ খান। নিজাম শাসিত হায়দরাবাদের নিজামের সঙ্গে পরামর্শ করেই একজন উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মহাম্মদ নওয়াজ খান দলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নিজামের পক্ষে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং অমুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ১৯৩৮ সালে এই দলের সভাপতি হন বাহাদুর ইয়ার জং। তখন থেকে এই দলটির ইসলামি ভাবধারা প্রকট হয়ে ওঠে। মুসলমান সম্প্রদায়িক ভাবনা জোরালো হয়। ইসলামের. প্রচার-প্রসার এই দলের অন্যতম অভিমুখ হয়। ১৯৩৭ সালে আর এক সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লিগের সঙ্গে মিমের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময় থেকে মিম ও মুসলিম লিগের গঠবন্ধনের লক্ষ্য হয় হায়দরাবাদকে স্বাধীন ইসলামিক দেশ তৈরি করা। ১৯৪৪ সালে মিমের সভাপতি হন আলিগড়ে লালিতপালিত কট্টরপন্থী কাশিম রিজভি। ১৯৪৭ সালে যখন ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হলো, তখন ভারত স্বাধীন আইন ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে যে বিধিব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত বা পাকিস্তান যে কোনো দেশে যোগদান করতে পারে অথবা স্বাধীন থাকতে পারে। হায়দরাবাদের নিজাম উসমান আলি কোনো পক্ষেই যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

নিজাম ভারতভুক্তিতে সই না করলেও ভারতের সঙ্গে ১৯৪৭ সালে ২৯ নভেম্বর 'স্ট্যান্ড স্টিল এগ্রিমেন্ট' নামে একটি চুক্তি সই করেন। চুক্তি অনুযায়ী বলা হয় যে হায়দরাবাদের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ভারত হস্তক্ষেপ করতে পারবে কিন্তু সেখানে ভারতের সেনাবাহিনী রাখা যাবে না। যখনই হায়দরাবাদ এই এগ্রিমেন্ট সই করল সে সময়ে মিম নেতা এই কাশিম রিজভি স্ট্যান্ড স্টিল এগ্রিমেন্টের প্রবল বিরোধিতা করেন। এই সময় থেকে আলিগড়ে লালিত-পালিত কাশিম রিজভি হায়দরাবাদে একটি সশস্ত্র মুসলমান মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে। তাদের বলা হতো রাজাকার বাহিনী। এরা হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে এই চুক্তি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মিম হায়দরাবাদের পাকিস্তানে যোগদানের

পক্ষপাতী ছিল। তাদের মতে হায়দরাবাদ একটি ইসলামি দেশ হবে। তারা এটাকে দক্ষিণ পাকিস্তান করতে চেয়েছিল। রিজভি বলেছিলেন যে ইসলামি দেশ যুদ্ধ এবং বিজয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই তিনি জিহাদি সংগঠন সশস্ত্র মিলিশিয়া গঠন করে তাদের সদ্য স্বাধীন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন।

হায়দরাবাদের স্বতন্ত্র বিদেশনীতি, পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং রাজাকারদের উপস্থিতি সদ্য স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় দু'লক্ষের মতো রাজাকার বাহিনী সংগঠিত হয়। রাজাকার ছাড়াও এখানে অন্যান্য ইসলামিক গোষ্ঠীও অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। মিমের দ্বারা গঠিত হায়দরাবাদের রাজাকার বাহিনী হায়দরাবাদের গ্রামে-গঞ্জে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। হিন্দুদের হত্যা, হিন্দু নারী ধর্ষণ, অপহরণ, বাড়ি পোড়ানো, লুটপাট, সম্পত্তি দখল এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি তাদের নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়ালো। রাজাকারদের অত্যাচারে বহু হিন্দু হায়দরাবাদ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আশ্রয় নেয়। মধ্যপ্রদেশে প্রায় ৪০ হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

হায়দরাবাদে কংগ্রেসকে তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যখন হায়দরাবাদের ঘটনা ঘটছে তখন সেখানে ৮৫ শতাংশ হিন্দু। তা সত্ত্বেও সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের হস্তক্ষেপের ফলে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে হায়দরাবাদকে ভারতভুক্ত করা হয়। কাশিম রিজভিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আট বছর জেলে কাটানোর পর পাকিস্তানপন্থী জেহাদি এই নেতা পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। রাজাকারদের অত্যাচারের চিহ্ন এখনো তেলেঙ্গানার মানুষ বহন করে। ১৯৪৮ সালে মিম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যদিও কংগ্রেস সরকার ১৯৫৭-তে মিমের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এই রাজাকারদের উত্তরাধিকারী হলো আজকের আসাদুদ্দিন ওয়েইসি এবং তার এআইএমআইএম দল। হায়দরাবাদে কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করা হলে কংগ্রেস নেতারা রাজাকারদের ভয়ে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে কংগ্রেস তার ক্ষুদ্র রাজনীতির স্বার্থে জেহাদি মিমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল। এভাবে মিম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে যায়। আব্দুল ওয়াহিদ ওয়েইসি মিমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এর নাম দেন এআইএমআইএম। ১৯৭৫ সালে আব্দুল ওয়াহিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সালাউদ্দিন ওয়েইসি দলের দায়িত্ব পান। এভাবে মিম পারিবারিক দলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ থেকে ২০০৪ ওয়াহিদ সাতবার হায়দরাবাদ থেকে এমপি নির্বাচিত হন। তার বড়ো ছেলে আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বর্তমানে দলের সভাপতি এবং চারবারের লোকসভার সদস্য। তেলেঙ্গানা, বিহার, মহারাষ্ট্রে এই দলের এমএলএ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই আসাদুদ্দিন ওয়েসির মিম পশ্চিমবঙ্গে আসছে। তার বক্তব্য হলো বিজেপি ১৮টি আসন পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সেকুলার ফোর্স পরাজিত হয়েছে, তারা মাইনরিটি স্বার্থ সুরক্ষিত করতে পারেনি। তিনি মৌসম নুরের পরাজয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। তাই তিনি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদের যে বিধানসভাগুলি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই জায়গায় একটি বিকল্প শক্তি হিসেবে উঠে আসতে চান মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য। মনে রাখতে হবে, রাজাকার মিমের উত্তরাধিকার আসাদুদ্দিন বহন করছে। আরও মনে রাখতে হবে, এই মিম হায়দরাবাদকে পাকিস্তান করতে চেয়েছিল। এরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে বাস্তুহারা করেছিল। এই আসাদুদ্দিন ওয়েইসি এখন মিম ও ভীম অর্থাৎ তথাকথিত দলিত ও মুসলমান ঐক্যের কথা বলছেন, অথচ হায়দরাবাদে থেকে একসময় এই মিমই দলিতদের উদ্বাস্তু করেছিল। এই এমআইএম মুসলমানদের পার্সোনাল ল-এর পক্ষে। ইসলামিক টেক্সটের অভ্রান্ততায় তারা বিশ্বাসী। তিন তালাক রদ বিলের বিরোধী, এরা ভারতবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী এবং জেহাদি শক্তি। এরা কেবলমাত্র ইসলামের জয়ধ্বজা ওড়ানোর কথাই বলে। এমন একটি দল পশ্চিমবঙ্গে আসছে। এখানকার তথাকথিত সেকুলার বা বুদ্ধিজীবীরা বারবার বলছেন যে, আসাদুদ্দিন মুসলমান ভোট কাটলে বিজেপির জয় হবে। পরোক্ষে তারা বলছেন মুসলমান ভোট যেন এক দিকে থাকে, মুসলমান ভোট যেন মেরুকরণ হয়। কেন মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই তাদের ইচ্ছামতো দল বেছে নেওয়ার? মুসলমান ভোটটা এক জায়গায় পড়তে হবে —এক্ষেত্রে তারা মেরুকরণের পক্ষে। কিন্তু হিন্দু ভোট মেরুকরণের কথা যদি এখানে কেউ বলেন তাহলে সেটা হবে সাম্প্রদায়িকতা। আরেকটা বিষয় হলো এখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই মিম বা মুসলিম লিগের মতো দলগুলির আর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? মিমের উদ্দেশ্য ছিল হায়দরাবাদের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা, হায়দরাবাদ স্বাধীন ইসলামি রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তাদের নেতা তারপরম সুখাশ্রয় পাকিস্তানে চলে গেছেন। তবু এরা এখানে কেন? ভারতের রাজনীতিতে তাদের ইসলামি হায়দরাবাদের দাবি পূরণ তো সম্ভব নয়? তাদের উদ্দেশ্য হলো জেহাদি রাজনীতির দ্বারা ও ভারত সংস্কৃতির বিরোধিতা করে ভারতকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা।

**পশ্চিমবঙ্গের সেকুলার বা বুদ্ধিজীবীরা বারবার বলছেন যে, আসাদুদ্দিন মুসলমান ভোট কাটলে বিজেপির জয় হবে। পরোক্ষে তারা বলছেন মুসলমান ভোট যেন এক দিকে থাকে, মুসলমান ভোট যেন মেরুকরণ হয়। কেন মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই তাদের ইচ্ছামতো দল বেছে নেওয়ার?**

ভারতে ইসলামি রাজনীতির ধারাটা স্বাধীনতার আগে যেরকম ছিল আবার সেদিকে এগোচ্ছে। বিভিন্ন মুসলমান সংগঠনগুলি কেবলমাত্র মুসলমান স্বার্থ রক্ষার কথা বলছে। কিছু দল সেকুলারিজিমের জ্বরে আক্রান্ত। তারা সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগকে যেমন তোষণ করেছে, এখনও তোষণ করতে ব্যস্ত। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা হয়নি, অধিকার রক্ষা হয়নি ইত্যাদি তাদের বক্তব্য। তারা দেশ ভাগ করে নিয়ে গেছে, আবার তাদের জন্য এখানে সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শ্যামাপ্রসাদের দ্বারা মুসলিম লিগের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা হিন্দু বাঙ্গালির বাসস্থানে পাকিস্তানপন্থী মিম এসে যাচ্ছে, তাই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা সাবধান।

*(লেখক অধ্যাপক, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন সমিতি)*

# পঁচাত্তরটি বছর কি যথেষ্ট নয় দেশনেতার অসম্পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ করার জন্য?

**শুক্লা শিকদার**

নেতাজী সুভাষ— আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে তোলা একটি নাম। ভারতবর্ষ, ভারতবাসী তথা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির হৃদয়ে অন্তঃসলিলা এক আবেগ, অথচ সেই আবেগ প্রশ্নবাণে জর্জরিত।

১৯৪৫ সালের পর ১৮ আগস্ট তারিখটি ক্যালেন্ডারে আর একবার পেরিয়ে গেল। সুদীর্ঘ ৭৫টি বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা হলো না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান পরবর্তী সময়ে অনেক ঘটনার ঘনঘটা প্রত্যক্ষ করেছে পৃথিবী। অনেক জননেতার আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে কিন্তু সুভাষের অন্তর্ধান ও মৃত্যু সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি কখনো হারিয়ে যায়নি। কেউ ভোলেনি, কেউ ভুলতে পারেনি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ সেই জননেতা, সকলের প্রিয় নেতাজীকে। জনসভায় কিংবা বেতারবার্তায় যাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সকলকে শিহরিত করতো, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতো, আকৃষ্ট করত, দেশের প্রতি সবকিছু উজাড় করার জন্য। যার আহ্বান 'আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' শুনে আপামর ভারতবাসী একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। নিঃস্ব, রিক্ত কেউ পিছপা হয়নি, তার উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করতে, দুই হাতে দান করতে। শুধু জনতা নয় , তার মধ্যে ছিল এক অমোঘ আকর্ষণ যা কঠিন হৃদয় দেশনতাদেরও আকৃষ্ট করেছিল তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি।

কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হলো, তার বহু প্রতীক্ষিত অভিষ্ঠ পূরণের পথে তাকে বাধা পেতে হলো। হারিয়ে যেতে হলো অজানার উদ্দেশ্যে। কিন্তু যে প্রশ্নগুলো তিনি রেখে গেলেন সমস্ত বিশ্বের কাছে আজও তা উত্তরের অপেক্ষায় দিন গুনছে। যদি তার মৃত্যু হয়েই থাকে তবে সে খবর তার দেশবাসীর কাছে কেন এক সপ্তাহ পর এসে পৌঁছালো? অথবা তার মৃত্যু না হয়ে থাকলে কেন তার এই অন্তর্ধান?

**নেতাজীর অন্তর্ধান মৃত্যু নিয়ে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি আর কত চলবে? ৭৫টি বছর কি যথেষ্ট নয় উত্তর খোঁজার জন্য? দেশনেতার অসম্পূর্ণ ইতিহাস বয়ে নিয়ে কোনো প্রজন্মই কি যথাযথভাবে এগিয়ে যেতে পারে?**

কেন তাঁর অন্তর্ধান এবং মৃত্যু রহস্য বিশ্বের কাছে আজও অমীমাংসিত? কেন মাতৃভূমির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামী, কারাবরণকারী, আত্মত্যাগী নেতাজী তাঁর নিজের দেশে যোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেলেন না? ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় নেতাজীর সশস্ত্র আন্দোলন ও প্রতিবাদের ভূমিকাকে কেন প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হলো না? কেন ভারতের পাঠ্যপুস্তকে আজও ভারতের স্বাধীনতায় নেতাজীর ভূমিকাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়?

ভারতের ভূখণ্ডকে ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্ত করা এবং প্রথম স্বাধীন ভারতীয় সরকার গঠন করা নেতাজী কেন আজও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত নন? নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অফিসিয়াল ডেথ সার্টিফিকেট কেন জাপান সরকার আজও জনৈক 'ইচিরো ওকুরার' নাম থেকে তাঁর নামে পরিবর্তন করতে পারল না? এরকম আরো অনেক প্রশ্ন আজও আপামর ভারতবাসীকে তাড়া করে বেড়ায়। তাই একবার পিছনে ফিরে তাকানো যাক, ফিরে দেখা যাক গত ৭৫ বছরে নেতাজীর অন্তর্ধান ও মৃত্যু রহস্যকে ঘিরে বিভিন্ন রকম আশঙ্কা ও উদ্যোগের ঘনঘটাকে।

১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট দিনটিতেই শেষবারের জন্য জনসমক্ষে নেতাজীকে দেখা গিয়েছিল। সেই ঘটনাকে স্মরণ করেই নেতাজীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর সঙ্গে এই দিনটিকে সরকারি ভাবে তাঁর মৃত্যুদিন হিসেবে মান্যতা দেওয়ার কোনো যোগ নেই।

নেতাজী ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাতেই শহিদ হয়েছেন অথবা ওই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু তো দূর অস্ত, কোনও বিমান দুর্ঘটনাই ওইদিন তাইহোকুতে

ঘটেনি— নেতাজী রহস্যের প্রাথমিক স্তরে এই পরস্পর বিরোধী দুটি মতই নেতাজীর অন্তর্ধান ও মৃত্যু সম্পর্কে রয়েছে।

দুটি মতের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি রয়েছে, অস্বচ্ছতাও রয়েছে। যেমন, মনোজ মুখার্জি কমিশনের কাছে তাইওয়ান সরকারের অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের দেওয়া চিঠিতে জানানো হয়েছে, ওইদিন তাইহোকুতে কোনও দুর্ঘটনার কথাই তাদের কাছে থাকা নথিতে নেই। অর্থাৎ এটিই তাইওয়ান সরকারের অফিসিয়াল বিবৃতি।

যদিও তথাকথিত ওই বিমান দুর্ঘটনার সময়ে জাপানের আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি চলছে। সেই সময় ওই বিমান বন্দরের সামরিক বিমান চলাচলের নথি জাপানি সামরিক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত নাই করতে পারেন, বিশেষত যে দেশ, যে বিমানবন্দর তাদের নিজেদের নয়, যুদ্ধে দখল করা—সেখানকার পরবর্তী শাসকদের হাতে তা একদিন চলে যাবে জেনে। তাই নথি না থাকা আর বাস্তবে বিমান দুর্ঘটনা না ঘটা— এ দুইয়ের সংযোগ নাও থাকতে পারে, বিশেষত বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে। যদিও জাপান সরকারের তদন্ত কমিটি ১৯৫৬-তে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর তত্ত্বেই স্পষ্টভাবে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

**স্মৃতি আর অস্তিত্বের মাঝে তাঁর ত্রিশঙ্কু অবস্থানের অবশ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ দেশের একমাত্র সামরিক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেশবাসীর নিঃসংশয়ে 'শহিদ' সম্বোধনেরও উপায় নেই আজ।**

অন্যদিকে, আবার দুর্ঘটনার তত্ত্বে খোদ ব্রিটিশ ও পরে আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগের অবিশ্বাস ও আলাদা তদন্ত নেতাজীর অন্তর্ধান ও মৃত্যু রহস্যকে আরও গভীর করেছে। যদিও পরবর্তী সময়ে আশ্চর্যজনক ভাবে সেই সব তদন্তেরই সিদ্ধান্ত প্রায় এক।

সোভিয়েত রাশিয়া সূত্রে পাওয়া কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণও অবশ্য দুর্ঘটনার পরও নেতাজীর জীবিত থাকা ও সোভিয়েত থাকা নিয়ে কৌতূহল বাড়িয়েছে। যাঁরা তাইহোকুতে নেতাজীর মৃত্যুর তত্ত্ব মানেন না তাঁদের মোটের ওপর তিনটি মত।

(১) সোভিয়েত রাশিয়ায় নেতাজী চলে যান, দুর্ঘটনার মিথ্যে গল্প সাজিয়ে। সেখানে প্রথমে স্তালিনের আতিথ্যে ও আদরে এবং স্তালিনের মৃত্যুর পর চরম অত্যাচারে সোভিয়েতে কারাগারে বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তাঁর মৃত্যু হয়। অথবা, স্তালিনের মৃত্যুর পরও নেতাজী রাশিয়াতেই ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও এক অজ্ঞাত পরিচয়, ব্যক্তির ছবি দেখিয়ে এই তত্ত্বের সমর্থকরা বলেন নেতাজী সক্রিয় ভাবে এরপরও দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতীয় উপমহদেশের রাজনীতিতে তাঁর অবদান রেখে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনেও একটি কারণ নেতাজী রহস্য এবং সেই অজ্ঞাত পরিচয় নেতাজী সদৃশ ব্যক্তির উপস্থিতি।

(২) নেতাজী প্রথমে সোভিয়েতে থাকলেও পরে এক সাধু বা সন্ন্যাসীর বেশে ভারতে ফিরে আসেন। রামজন্মভূমির কাছেই ভগবানজী বা গুমনামি বাবা হিসেবে তাঁর জীবন কাটে। দেশে থেকে জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা ঘটনা ও

সঙ্কটে তিনি তাঁর কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৯৮৫-তে ফৈজাবাদ শহরেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

যিনি যৌবনে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হবার আধ্যাত্মিক বাসনা ছেড়ে, দেশের সেবায় রাজনীতিকের জীবন বেছে নিয়েছিলেন তিনি দেশ স্বাধীন হয়েছে দেখেও এবং স্বাধীন দেশের সামনে হাজারো সঙ্কট দেখেও কীসের ভয়ে বা কোন বিতৃষ্ণায় রাজনৈতিক জীবন থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে এক 'গুমনামি' সাধুর জীবন বেছে নিলেন, সে প্রশ্নের উত্তর : হতে পারে আদর্শগত পরাজয়, দেশভাগ ও তৎকালীন স্বাধীন ভারতীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা। নেতাজীকে যোগ্য সম্মানে ভূষিত করার ব্যাপারে অনীহা।

তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজীর মৃত্যুকে মান্যতা দিয়েও কোনো কারণে জাপানি সামরিক কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর পরও সুভাষচন্দ্র বসুর ডেথ সার্টিফিকেটটি তাঁর নিজের নামে লিখলেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায়, হাসপাতালে ভর্তি করার সময় যে কোনও মুহূর্তে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যদের তাইওয়ানে পা রাখার আশঙ্কা ছিল। সম্ভাব্য সেই বিপদের ক্ষেত্রে নেতাজীর প্রকৃত পরিচয় ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনার কাছে গোপন রাখতেই পেশেন্ট ডি টেলস অন্য নামে (এক জাপানি অফিসারের নামে) ফিলাপ করা হয়েছিল, তাহলেও মৃত্যুর পর সেই তথ্য গোপন করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। বিশেষত, নেতাজীর তথাকথিত 'চিতাভস্ম' যখন কোনও গোপনীয়তা ছাড়াই জাপানের রেনকোজি মন্দিরে স্বনামে রাখার বন্দোবস্ত করেন জাপানি কর্তৃপক্ষ।

তাই সুভাষচন্দ্র বসুর অফিসিয়াল ডেথ সার্টিফিকেট কেন জাপান সরকার আজও জনৈক 'ইচিরো ওকুরার' নাম থেকে তার নামে পরিবর্তন করতে পারল না, সেই সঙ্গত প্রশ্নও তৎকালীন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কাম্য ছিল। যা আজও দ্বিপাক্ষিক স্তরে সরকারিভাবে তোলার এবং দুই দেশের সরকারের পক্ষ থেকেই বিবৃতি লাভের অপেক্ষায়।

তবে নেতাজী অনুরাগীরা মনে করেন, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা হতে পারে তিনটি দেশের সরকারের সাহায্যে। জাপান, সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারত। জাপানে এখনও নেতাজী সম্পর্কিত দুটি ফাইল ডি-ক্লাসিফই করা হয়নি। তাই ভারত-জাপান দীর্ঘ সুসম্পর্কের সুবাদে জাপান সরকারকে নেতাজী সম্পর্কিত এই দুটি ফাইল ডি-ক্লাসিফাই করতে অনুরোধ জানানো ভারত সরকারের পক্ষে খুবই ন্যায্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কূটনৈতিক দাবিগুলোর একটা হতেই পরে।

অতীতে রেনকোজী মন্দিরের নেতজীর তথাকথিত চিতাভস্ম সরাসরি দেশে নিয়ে আসার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, তার ছিঁটেফোঁটাও ফাইল ডি-ক্লাসিফাই করতে জাপান সরকারের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে ছিল না।

সোভিয়েত রাশিয়া আজ লুপ্ত। কিন্তু সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি-র সব নথি এখন রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ-র হস্তগত। ভারতের পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সম্পর্কিত কোনও নথি বা প্রমাণ পেশ করতে সোভিয়েত রাশিয়ার শাসকদের সঙ্গে কোনও স্তরে কথা বলেনি। মুখার্জি কমিশন এ বিষয়ে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানালেও তৎকালীন সরকার এ প্রসঙ্গে নীরবতা পালন করে গেছে।

২০১৬-র ২৩ জানুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে দু'শোরও বেশি নেতাজী সম্পর্কিত ফাইল ও নথি ডি-ক্লাসিফাই করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাজ্য আর্কাইভে থাকা ৬৪টি ফাইল ২০১৫-র আগস্টেই প্রকাশ্যে এসেছে। তাইহোকু দুর্ঘটনার দু'দশক পরেও নেতাজীর পরিবারের সদস্যদের গতিবিধি এমনকী তাদের চিঠিপত্রেও নজরদারি চালানোর মতো কিছু তথ্য নেহরু-গান্ধী পরিবারের উক্ত কর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক করেছে।

নেতাজীর অন্তর্ধান মৃত্যু সম্পর্কিত কোনো তত্ত্বকে খারিজ করার মতো কিংবা কোনো তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার মতো নিশ্চিত প্রমাণ না-পাওয়া অব্দি কোনো তত্ত্বকে জোর করে স্থাপন করার চেষ্টা নেতাজী সংক্রান্ত গবেষকদের প্রতি অবমাননাকর হবে। তবে নেতাজী রহস্যের দরজা খোলার চাবি আছে নেতাজীর দেশের সরকারের হাতেই, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকারে আসার পর নেতাজী সমগ্র আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করেছিলেন শহিদ ও স্বরাজ। নরেন্দ্র মোদী তার খণ্ডাংশের দুটি দ্বীপের নাম করে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

তথাকথিত অন্তর্ধানের ৭৫ বছর পরেও সুভাষচন্দ্র বসুর ঘরে ফেরা হলো না। ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫-এ বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ভারতবাসী জানতে পেরেছিল ৭ দিন পর। ২৫ আগস্ট। দেরির সেই শুরু। আজও নিশ্চিত খবরটি এসে পৌঁছল না। জাপানি নিউজ এজেন্সির সেই খবর সেদিন ভারতবাসীর কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাত। পরের ৭৫ বছর নেতাজীর অস্তিত্বের খোঁজে মেঘের পর মেঘ জমেছে। স্মৃতি আর অস্তিত্বের মাঝে তাঁর ত্রিশঙ্কু অবস্থানের অবশ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ দেশের একমাত্র সামরিক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেশবাসীর নিঃসংশয়ে 'শহিদ' সম্বোধনেরও উপায় নেই আজ।

শত যুক্তি ও যুক্তি খণ্ডনের ডামাডোলে ১৮ আগস্ট দিনটিকে নেতাজীর মৃত্যু দিবস হিসেবে মান্যতা দেওয়ার পক্ষে কোনো অকাট্য যুক্তি যখন পাওয়া যায়নি তখন আপামর ভারতবাসী নেতাজী অনুরাগীগণ কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী, নিরপেক্ষ গবেষণা ও তদন্তের মাধ্যমে নেতাজীর অন্তর্ধান ও মৃত্যু সম্পর্কিত একটি অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ করার জন্য। নেতাজীর অন্তর্ধান মৃত্যু নিয়ে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি আর কত চলবে? ৭৫টি বছর কি যথেষ্ট নয় উত্তর খোঁজার জন্য? দেশনেতার অসম্পূর্ণ ইতিহাস বয়ে নিয়ে কোনো প্রজন্মই কি যথাযথভাবে এগিয়ে যেতে পারে?□

# দুর্জনের ছলের অভাব হয় না

# গোপন নথি তুলে ধরলো চীনের চেহারা

**ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥** করোনা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নিন্দিত ও কঠোরভাবে সমালোচিত চীন এখন পাল্টা দাবি করে অভিযোগ ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। চীনা বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন মহামারী করোনা ভাইরাস চীনের উহান থেকে নয়, বরং এটি বাংলাদেশ ও ভারত থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই খবর প্রকাশ করে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য সান। হংকংভিত্তিক গণমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টেও এই খবর এসেছে। সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের গবেষকদের একটি গবেষণাপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্য সানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনা বিজ্ঞানীদের দাবি, ভাইরাসটির উৎস হতে পারে ভারত বা বাংলাদেশ। খবরটি ভারতের গণমাধ্যমেও এসেছে।

চীনা বিজ্ঞানীদের এমন দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এএসএম আলমগীর বলেন, এটি রীতিমতো ভূয়া একটি তথ্য। এর মধ্যে কোনো বিজ্ঞান নেই। এটি কোনো গবেষণা বলেও বিবেচনা করা যায় না। এর পেছনে হয়তো অন্য কোনো মতলব থাকতে পারে চীনের।

গত বছর নভেম্বরে চীনের উহানে প্রথম ধরা পড়ে নভেল করোনা ভাইরাস। তারপর থেকে এক বছরে প্রায় সাড়ে ছ'কোটি সংক্রমণ। মৃত্যু ১৫ লক্ষ ছুই ছুই। মারণ সংক্রমণের জন্য বারবার কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছে চীনকে। কখনও 'চীনা ভাইরাস', কখনও 'চীনা ফ্লু', কখনও 'উহান ভাইরাস' নাম দিয়ে দায়ী করা হয়েছে চীনকে। চীন আবার জাতিবৈষম্যের পাল্টা অভিযোগ তুলেছে। এবার তারা প্রমাণ করতে তৎপর করোনা ভাইরাসের উৎস চীন নয়। চীনের আগেই অন্য কোনও দেশ থেকে ছড়িয়েছিল ভাইরাসটি। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।

বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ভাবে খবর তৈরি শুরু করেছে চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যম। তাদের বক্তব্য, উহানের বাজারে মাংসের মধ্যে যে ভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল, সেটাই উৎস নয়। গত বছর ডিসেম্বরের আগেই চীন সীমান্তের বাইরে ভাইরাসটি ছড়িয়েছিল।

**মহামারীর শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে আসছিল, করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পেছনে চীনের ভূমিকা রয়েছে। এমনকী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প করোনা ভাইরাসকে চীনা ভাইরাস হিসেবেও আখ্যায়িত করেন।**

'পিপলস ডেইলি' গত সপ্তাহে একটি ফেসবুক পোস্টে দাবি করে, যা যা তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট, চীনের উহান থেকে কোনো মতেই সংক্রমণ শুরু হয়নি। চীনের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেশন'-এর প্রাক্তন প্রধান এপিডিমিয়োলজিস্ট জয়েং গুয়াং বলেন, উহানে প্রথম ভাইরাসটি চিহ্নিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে উহান এই ভাইরাসের উৎস নয়।

চীনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্রও বলেন, ভাইরাসটি কোথায় প্রথম চিহ্নিত হয়েছে, আর ভাইরাসটি কোথায় প্রথম অন্য প্রাণীর দেহ থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছে, দুটো বিষয় যে আলাদা, সেটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। চীনে প্রথম চিহ্নিত হয়েছে মানেই যে চীন এর উৎস, তা নয়। উৎস কোথায় সেটা খুঁজে দেখতে হবে। হয়তো একাধিক দেশ, একাধিক অঞ্চল এর উৎস। এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্রও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল 'ল্যানসেট'-এ জমা দিয়েছে চীন। এখনও অবশ্য রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়নি। রিপোর্টের সারমর্ম এই যে, মানুষ থেকে মানুষের দেহে সার্স-কোভ-২ সংক্রমণ উহানে প্রথম হয়নি। রিপোর্টে এও দাবি করা হয়েছে, প্রথম সংক্রমণ হয়তো ভারতীয় উপমহাদেশে হয়েছে।

কিন্তু চীনা দাবির গোমর ফাঁক করে দিয়েছে একটি গোপন নথি। উহানে করোনা মহামারীর একেবারে শুরুর দিনগুলো চীন কীভাবে মোকাবিলা করেছিল সে সংক্রান্ত নতুন একটি গোপন নথি প্রকাশিত হয়েছে। যা চীনা দাবিকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। 'দ্য উহান ফাইলস' শিরোনামের ১১৭ পৃষ্ঠার বিশদ ওই অভ্যন্তরীণ নথিটি হাতে পেয়েছে

সংবাদমাধ্যম সিএনএন। ফাঁস হওয়া ওই নথিটিতে উঠে এসেছে, চীন শুধু উৎসই নয়, করোনা ঢেউয়ের একেবারে প্রথম দিকে চীনা কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার চিত্র। এতে বলা হয়েছে, প্রথম দিকে নতুন করে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লেগেছে। যুক্তরাষ্ট্র-সহ পশ্চিমি দেশগুলো চীন সরকারের বিরুদ্ধে করোনার তথ্য লুকানোর অভিযোগ আনে।

হুবেই প্রদেশের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা কীভাবে ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত করেছিলেন, ধারাবাহিক তহবিল স্বল্পতা কীভাবে তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাজ ও পরীক্ষা, সরঞ্জাম সংক্রান্ত নানা তথ্য উঠে এসেছে এ প্রতিবেদনে। কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন-এর সিনিয়র ফেলো ইয়ানজং হুয়াং বলেন, এটি স্পষ্ট যে, তারা ভুল করেছে। এটি শুধু কোনও নভেল ভাইরাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সংঘটিত ভুলই নয়, বরং তারা যেভাবে কাজ করেছে সেখানে আমলাতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত ত্রুটি ছিল।

উহানে কোভিড-১-এর প্রকোপ শুরু হওয়ার সময় কর্মকর্তারা কী জানতেন এবং তারা প্রকাশ্যে কী বলেছিলেন এ দুইয়ের মধ্যকার নানা অসঙ্গতিও উঠে এসেছে হুবেই-র প্রাদেশিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের এসব গোপন নথিতে। ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগের অধ্যাপক উইলিয়াম শ্যাফনার বলেন, কর্মকর্তাদের ধারণা ছিল যে কোনও মুহূর্তে মহামারীটির প্রভাব কমে যেতে পারে। ফলে তখন তারা মোট আক্রান্তের কোনও তালিকাও তৈরি করেনি।

'অভ্যন্তরীণ নথি, দয়া করে গোপনীয়তা রক্ষা করুন' এমন মার্ক করা ওই নথিতে দেখা গেছে, ২০২০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা পাঁচ হাজার ৯১৮টি নতুন সংক্রমণের কথা জানিয়েছিলেন। অথচ কর্তৃপক্ষ তখন জনসমক্ষে মোট শনাক্তের সংখ্যা দেখিয়েছিল দুই হাজার ৪৭৮। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে আক্রান্তের যে সংখ্যা তার অর্ধেকেরও কম দেখিয়েছিল চীনা কর্তৃপক্ষ। প্রথম থেকেই চীনের বিরুদ্ধে করোনার প্রকৃত পরিস্থিতি গোপন করার অভিযোগ রয়েছে। সবই করা হয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে। উহানের একজন স্বেচ্ছাসেবী বলেন, বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন যে কোনও মানুষ এই সংখ্যা (সরকারি পরিসংখ্যান) নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবেন। মহামারীর শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে আসছিল, করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পেছনে চীনের ভূমিকা রয়েছে। এমনকী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প করোনা ভাইরাসকে চীনা ভাইরাস হিসেবেও আখ্যায়িত করেন।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন স্টাডিজ প্রোগ্রামের পরিচালক অ্যান্ড্রু মের্থা বলেন, চীন বাইরের দুনিয়ায় তার ইমেজ রক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। করোনা আক্রান্তদের সংখ্যা কম দেখানোর ক্ষেত্রে নীচের পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উৎসাহ ছিল স্পষ্ট। অথবা ঊর্ধ্বতনদের তারা দেখাতে চাইতো যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কম রিপোর্ট করছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ কর্মকর্তারা তাদের পদ্ধতির উন্নয়ন করেন। হুবেই-এর স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা হয়, যারা এসবের জন্য দায়ী ছিল।

ফাঁস হওয়া নথিতে আরও বলা হয়, প্রাদুর্ভাবের প্রথম কয়েক মাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে গড়ে ২৩.২ দিন সময় লেগেছিল। ফলে সরকারের জন্য শনাক্তের নিয়মিত আপডেট না দিয়ে পুরনো সংখ্যা প্রচারের সুযোগ তৈরি হয়।

জনস হপকিন্স সেন্টার ফর হেলথ সিকিউরিটির চিকিৎসক আমেশ আদালজা বলেন, তিন সপ্তাহের পুরানো ডাটা তিনি দেখেছেন এবং আজকের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

৭ মার্চের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তখন নতুন করে শনাক্ত হওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ৮০ ভাগেরও বেশি ক্ষেত্রে একই দিনে পদ্ধতিগত রেকর্ড করা শুরু হয়।

চীনের ফাঁস হওয়া নথি অনুযায়ী, দেশটির কর্মকর্তারা কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মাত্রা বুঝতে পারেনি। এটি একটি আন্তর্জাতিক সংকটে রূপান্তরিত হবে, এটি তারা অনুধাবন করতে পারেনি।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনা ভাইরাস। উৎপত্তিস্থল চীনে এখন ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই ভাইরাসের প্রকোপ ১৩ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে গত ১১ মার্চ দুনিয়াজুড়ে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

আমেরিকার দুই মহাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় সংক্রমণ এখনও দ্রুত বাড়ছে। অন্যদিকে ইউরোপকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে করোনা কিছুটা স্তিমিত হলেও সেখানে আবারও নতুন করে রোগটির প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, এখন আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হওয়ার হার দ্রুত বাড়ছে।

করোনা ভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্তের ঠিক এক বছর পূর্ণ হলো ১ ডিসেম্বর। ন্যানসেট মেডিকেল জার্নালের এক গবেষণা অনুযায়ী, গত বছরের এই দিনে হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানে প্রথম কোনো করোনা রোগী শনাক্ত হয়, যার শরীরে এর উপসর্গগুলো ছিল।

সিএনএন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১০ ফেব্রুয়ারি বেইজিং থেকে উহানের সম্মুখসারির চিকিৎসাকর্মীদের উদ্দেশে কথা বলেন চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার দূরে নিরাপদ ঘরে বসে চীনা প্রেসিডেন্ট করোনায় নিহত উহানবাসীর জন্য সান্ত্বনা দেন। নতুন রোগটি ঘিরে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের মুখে এ বিষয়টি আরও বেশি খোলাসা করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। ওই দিনই চীনা কর্তৃপক্ষ দেশটিতে ২ হাজার ৪৭৮ জনের করোনা সংক্রমণের কথা জানায়। ওই সময় পর্যন্ত বিশ্বে করোনা শনাক্ত হয় ৪০ হাজারের কিছু বেশি।

ওই সময়ে চীনের মূল ভূখণ্ডের বাইরে শনাক্তের সংখ্যা ছিল ৪০০ জনের কম। কিন্তু সিএনএনের হাতে অভ্যন্তরীণভাবে ফাঁস হওয়া নথি বলছে, চীন ওই সময়ে করোনা শনাক্তের যে সংখ্যা দেখিয়েছিল, তা খণ্ডচিত্র মাত্র। □

# ভারতকে লগ্নির পীঠস্থান করে তুলতে নয়টি সোপান

অজয় শ্রীবাস্তব

**শুধুমাত্র প্রকল্প শুরুর সময় সুবিধে পেলেই হবে না পরবর্তী প্রত্যেকটি ধাপে এই সুবিধে সুনিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগকারীর পক্ষে কোনটি তাকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো সেরা প্রকল্প হবে— নির্ধারণ করা থেকে স্থান নির্বাচন, যে ধরনের কাঁচমাল আমদানি করতে হতে পারে তার নিশ্চয়তা দেওয়া থেকে তৈরি বস্তুটি জাহাজে ওঠা অবধি গোটা প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করার পথ সুগম করার কাজে সরকারকে মদত দিতে হবে।**

বিগত পাঁচবছরে ভারতে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এসেছে রেকর্ড ২৫০ বিলিয়ন ডলার। এটা প্রমাণ করে বিশ্বের উৎপাদনকারীরা ভারতের কর্ম পদ্ধতির ওপর কতটা আস্থাশীল। এর ওপর দীর্ঘদিনের নজর না দেওয়া প্রতীক্ষিত সংস্কারগুলি একের পর এক ঘটে চলার পর সর্বোত্তম বিনিয়োগ কেন্দ্র হয়ে উঠতে গেলে দেশের আর কী করণীয়?

এর সফলতা নির্ভর করবে বিনিয়োগকারীর ভারতে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিপদে স্বাচ্ছন্দ্যকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে। শুধুমাত্র প্রকল্প শুরুর সময় সুবিধে পেলেই হবে না পরবর্তী প্রত্যেকটি ধাপে এই সুবিধে সুনিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগকারীর পক্ষে কোনটি তাকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো সেরা প্রকল্প হবে— নির্ধারণ করা থেকে স্থান নির্বাচন, যে ধরনের কাঁচমাল আমদানি করতে হতে পারে তার নিশ্চয়তা দেওয়া থেকে তৈরি বস্তুটি জাহাজে ওঠা অবধি গোটা প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করার পথ সুগম করার কাজে সরকারকে মদত দিতে হবে। এটিই বিনিয়োগ টনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম 'লাল গলিচা' অভ্যর্থনা। এই সূত্রে আমরা ৯টি ধাপের কথা বলব।

(১) বিশেষভাবে নজর দিতে হবে ক্ষেত্র নির্বাচনে। ভারত যে যে পণ্যের উৎপাদনে দুর্বল ও রপ্তানি নিতান্তই কম সেগুলির চিহ্নিতকরণ। যেমন ইলেকট্রনিক্স, কমপিউটার, টেলিকম, উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, কারখানায় লাগে এমন বহু ম্যাশিনারি এর মধ্যে পড়ে। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগুলির ভাগ ৭০ শতাংশ। যেখানে ভারতের অংশীদারী মাত্র ০.৭ শতাংশ। দেশে উৎপাদন সংক্রান্ত মদত (Product linked incentive) দেওয়া বস্তুগুলির তালিকায় এগুলি রয়েছে।

(২) ক্ষেত্র নির্বাচন (sector selection)-এর ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া। একটি বিশেষ ক্ষেত্র হয়তো বিশাল পরিমাণ উৎপাদন সক্ষম কিন্তু উৎপাদিত বস্তু বিক্রিতে লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে যেতে পারে। কেননা সেটি ভীষণভাবে আমদানি নির্ভর। উদাহরণ স্বরূপ অত্যাধুনিক ফোনের ইভি ব্যাটারি আমদানি করে এখানে অ্যাসেম্বলিং করলে লাভ বিশেষ থাকে না। অন্য কোনো মডেল নির্বাচন করে এমন উৎপাদক বাছাই করতে হবে যারা অধিকাংশ যন্ত্রাংশই ভারতে উৎপাদন করবে।

(৩) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উৎপাদক সংস্থাকে মহাগুরুত্বের ক্ষেত্রগুলিতে প্রধান উৎপাদক হিসেবে নিয়ে আসা। আমরা কিন্তু এইসব সংস্থার নাম জানি। ভারতের বহুবিধ বস্তুর উৎপাদন ক্ষেত্র দেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একজন প্রধানউৎপাদক গাইডের কাজ করবে এমন ব্যবস্থা দরকার। তাদের নিজস্ব উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি সংস্থা নিজেদের মজবুত করে বাড়তি লাভের মুখ দেখতে পারবে। ৮০'র দশকে জাপানের সুজুকি কোম্পানি ভারতে এসে অটোমোবাইল ক্ষেত্রের চেহারাটাই বদলে দিয়েছিল। সুজুকির প্রযুক্তির সঙ্গে কাস্টিং, ফর্জিং ও ফ্যাব্রিকেশনের কাজে ভারতের বিশেষ দক্ষতার মেলবন্ধনে যুগান্তর ঘটে যায়। মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে কেবলমাত্র মারুতি সুজুকি নয় গোটা অটেমোবাইল সেক্টরেই উৎপাদনশীলতা ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর পেছনে ছিল মারুতি সুজুকির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চাপ। আজকের জিডিপি-তে উৎপাদন ক্ষেত্রের যে অংশ তার ৫০ শতাংশ আসে 'অটো সেক্টর' থেকেই। এই মারুতির গল্পটা আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৪) প্রধান ও বিখ্যাত উৎপাদকদের সঙ্গে উপযুক্ত সহযোগ গড়ে তোলা। যে কোনো বিরোধের বিষয়গুলি উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তিদের সঙ্গে একের সঙ্গে এক ভিত্তিতে বসে মিটিয়ে নিতে হবে। উৎপাদন স্থল নির্বাচনে মতানৈক্য দেখা দিলে বা বাড়তি সাপোর্টের দরকার হলে মুখোমুখি বসে জলদি পথ উভয়পক্ষই ঠিক করবে। বিনিয়োগকারীর তরফে এ বিষয়ে একজন সংযোগকারী আধিকারিক নিযুক্ত করে সরকারের সঙ্গে গোটা প্রকল্প নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করা নিশ্চয় সুফল দিতে পারে।

(৫) কারখানা তৈরির জমি বণ্টন যত শীঘ্র ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জমি জোগাড় করতে ও নানা ধরনের ছাড়পত্র পেতে দেরি বিনিয়োগকরীকে ভাগিয়ে দেবে। চীন ও অন্যান্য বেশ কিছু দেশে শিল্প উৎপাদন শুরু করার জন্য শত শত অঞ্চল চিহ্নিত করা আছে। যেখানে চটজলদি শিল্প স্থাপন করা যায়। এই নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলি ভবিষ্যৎ শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয় অনুমতি আগেভাগেই নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। যেমন ধরুন একটি কেমিক্যাল জোন গোড়াতেই বর্জ্য নিষ্কাশনের অনুমতি জোগাড় করে নেয়। বিনিয়োগকারীর সমস্যাগুলি আগেই সমাধান করা থাকে। বিনিয়োগকারী মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার যন্ত্রপাতি, মেশিন নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে প্রাথমিক উৎপাদন শুরু করে দেয়। আমাদের দেশে ৩২টি জায়গায় ইডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হয়েছে সেখানে এই মডেল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৬) কারখানা থেকে উৎপাদিত পণ্য দ্রুত জাহাজে তোলার ব্যবস্থা জরুরি। বিশ্বের উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলে সঠিকভাবে অংশগ্রহণে ভারতের যে ঘাটতি তার মূলে এই কারখানা থেকে বন্দরে পৌঁছানোয় দেরিই অন্যতম কারণ। নির্দিষ্ট ফেরিঘাট করিডোর তৈরি রাখলে এই সময় অনেকটাই বাঁচবে। এক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চলগুলিকে সমুদ্রের কাছাকাছি স্থাপন করা সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। শিল্পাঞ্চলের মধ্যেই বন্দর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে নেওয়ার ব্যবস্থা করলে বন্দরে ভিড় হবে না ও মাল তাড়াতাড়ি উঠে সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।

(৭) যে কাঁচামালগুলি আমদানির পর ভ্যালু অ্যাডেড পদ্ধতিতে আবার রপ্তানিযোগ্য হয়ে উঠবে সেক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক কমানোর কথা ভাবা দরকার। যেমন অধিকাংশ বৈদ্যুতিন সামগ্রী এখানে অ্যাসেম্বলিং করা হয় যার অজস্র যন্ত্রাংশ পৃথিবীর নানা দেশে তৈরি হয়। আমাদের এখানে ফিনিশড প্রোডাক্ট বহুক্ষেত্রে অন্য দেশে রপ্তানিও হয়। কিছুটা আমদানি শুরু করলে বড়োসড়ো উৎপাদন তথা রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটতে পারবে। এ কারণেই বিশ্বের বহু দেশ বৈদ্যুতিন সামগ্রীর যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক না নিয়ে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

(৮) সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেন একটা স্থিতিশীলতা থাকে। হঠাৎ হঠাৎ নীতিগত পরিবর্তন ঘটে গেলে অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কর ব্যবস্থায় কোনো ধোঁয়াশা না রেখে এটিকে সহজবোধ্য ও গ্রাহক বান্ধব করে তোলা প্রয়োজন। Royalty ও ডবল ট্যাক্স দেওয়ার বিরোধের কারণে যখন নোকিয়া কোম্পানি ভারতে উৎপাদন বন্ধ করল তার পরিণতিতে ভারত থেকে ২ বিলিয়ন ডলারের ফোন রপ্তানি শূন্যে এসে ঠেকল। দশ হাজারের বেশি চাকরি গেল সরাসরি । লাভ হলো চীনের। ভারত ও নোকিয়া উভয়েই ক্ষতির সম্মুখীন হলো।

(৯) বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি হতে পারে এমন পরিকাঠামো তৈরি রাখা। উৎপাদক সংস্থা অন্যান্য অনেক সংস্থার সঙ্গেই মাল ও সার্ভিস দেওয়া নেওয়ার বহু চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আকছারই বিরোধ বাঁধার সম্ভাবনা থাকে। বিরোধ বাঁধলে বাদী-বিবাদী উভয়েই আদালতের শরণাপন্ন হয় যাতে চুক্তি বলবৎ করা যায়। ভারতের আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা এক্ষেত্রে ভারতকে উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে আকর্ষণহীন করে দেয়। অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান দরকার এ ব্যাপারে। অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতি ভাবতেই হবে। একটি বিনিয়োগকে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে সফল করে তোলা একটি শষ্যবীজ রোপণ করা থেকে ফসল ঘরে তোলার প্রক্রিয়ার মতো। বিশ্ববিখ্যাত উৎপাদক সংস্থাগুলি এমনই সব অতি উচ্চমানের বীজ যারা উপযুক্ত সহযোগিতার পরিবেশ পেলে সার্থকভাবে বেড়ে ওঠে। এদের নিয়ে কাজ করতে পারলে ফলের আশা বৃথা যায় না। স্যামসাং কোম্পনি ১০ বছর আগে ভিয়েতনামে ছোটোভাবে শুরু করেছিল। কিন্তু সে দেশে কাজের সুন্দর অভিজ্ঞতার নিরিখে উৎপাদনে বিপুল বৃদ্ধি ঘটিয়ে এমন বিশ্বব্যাপী ৫০ বিলিয়ন উৎপাদিত বস্তু রপ্তানি করছে। এদের সাফল্য অন্য আরও অনেককে টেনে এনেছে। আলোচিত ৯টি সুত্রের ধাঁচাটি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলে বিশ্বের দরবারে উৎপাদন ও বিনিয়োগ স্থল হিসেবে ভারতের দাবি জোরদার হবে তুলবে।

*(লেখক ভারতের বাণিজ্য সেবা আধিকারিক)*

*With Best Compliments form :*

A
Well Wisher

## স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের স্বেচ্ছাচারিতা

১৪ বছর আগে ২০০৬ সালে আমার পুত্র অনুপের বিয়ে হয় নেপালের নাগরিক সঙ্গীতার সঙ্গে। ভারতের আইন অনুযায়ী ৬ বছর পর আমার পুত্রবধূ সঙ্গীতা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করে। পুলিশ ইনক্যুয়ারি হয়। ভারতের আইন অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য দিল্লিস্থিত নেপালের দূতাবাসের মাধ্যমে নেপালের নাগরিকত্ব ছাড়তে বাধ্য হয় সঙ্গীতা। যথা সময়ে নেপাল সরকার নাগরিকত্ব ছাড়ার Termination Certificate দেয় নেপালি ভাষায়। সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় নোটারি পাবলিক কাম মেমো যুক্ত চিঠিও দেয়। ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী সার্টিফিকেট দুটি কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিটিজেনশিপ বিভাগে পাঠানো হয়। গত ২৫.৭.২০১৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সার্টিফিকেটগুলি নয়া দিল্লিস্থিত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে পাঠিয়ে দেয়। আমরা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় ৫-৬ মাস পরে মন্ত্রালয় জানায় তাঁরা ট্রান্সলেশন কপি পেয়েছে কিন্তু অরিজিনাল কপি পায়নি। এরূপ চিঠি পেয়ে আমাদের মাথায় বজ্রপাত হলো।

অস্বাভাবিক দেরি করে জানাবার জন্য ঘটনাটি সন্দেহজনক বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারকে বার বার জানায় তাঁরা যথা সময়ে সার্টিফিকেটগুলি পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেক লড়াইয়ের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় Authenticated Certificate চায়। এর উত্তরে সঙ্গীতা জানায় যে আপনাদের কাছে নেপাল সরকারের অরিজিনাল ইংরেজি নোটারি কাম লেটার আছেই, এর থেকে ভালো Authenticated Certificate আর কী হতে পারে। সিটিজেনশিপ দিন। এবার তাঁদের কাছে কোনও অজুহাত না থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা জানায় সঙ্গীতাকে নতুন ভাবে আবার নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। আবার মাথায় বাজ পড়ল। সঙ্গীতা লেখে, আপনারা অবাস্তব কথা লিখেছেন। অমূল্য ১৪ বছর চলে গেল, জীবন শেষ হয়ে যাবে। যাই হোক, শেষে ৪ আগস্ট ২০২০ সালে Director, Citizenship of India লেখেন, আপনার ফাইল কলকাতার সিটিজেনশিপ বিভাগে পাঠানো হয়েছে Authenticated Termination অর্থাৎ Renunciation Certificate-এর অভাবে।

এর আগে সঙ্গীতার স্বামী অর্থাৎ আমার পুত্র অনুপের সবরকম নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও তাকে পাসপোর্ট বানাতে বাধ্য করা হয়। অনুপের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের ভারতীয় নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে একবারের পরিবর্তে তিনবার জেলা শাসকদের সম্মুখে শপথ নিতে বাধ্য করে সঙ্গীতাকে। এভাবে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ৬ বার রেজিস্ট্রি চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়। তিনি বা তাঁর লোক একটিরও জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। নেপাল সরকারের দেওয়া ইংরেজি সার্টিফিকেটকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরাসরি অস্বীকারও করছেন না, আবার স্বীকারও করেছেন না। এখন সঙ্গীতা হতাশ হয়ে বলছে, অনাগরিক হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই ভালো। যতদূর জানি, Hague Conference 1930 অনুযায়ী এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী, একজন মহিলা বিদেশিনীকে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর দেশের নাগরিক হয়ে যায়। যাই হোক, এখনও সে ভারতীয় নাগরিকত্ব পায়নি। মাঝখানে নেপালের নাগরিকত্ব হারালো।

উল্লেখ্য, ভারত সরকারের মন্ত্রণালয় আমাদের deficiency-র কথা বলছেন, আমাদের একটি deficiency হতে পারে যে, আমরা দিল্লি গিয়ে আমলাদের কাছে মৌখিক আবেদন করিনি বা হাত-পা ধরিনি। উল্লেখ্য, সঙ্গীতা একজন গৃহবধূ এবং অনুপ একজন দোকানদার। এ অবস্থায় আমরা কোথায় যাব, মন্ত্রণালয়ের হঠকারিতায় আমরা দিশাহীন। তাই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লিখছি, যদি কিছু হয়। সহযোগিতা কামনা করি।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

## রামমন্দির আন্দোলন

দীর্ঘ প্রায় দেড়শত বছর ধরে চলতে থাকা অযোধ্যায় রামমন্দির আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত রামজন্মভূমিতে রামমন্দির নির্মাণের রায় প্রদান করেছিল। ২৮ বছর ধরে চলতে থাকা বাবরি মামলায় অভিযুক্ত ৩২ জনকেই আদালত বেকসুর খালাস করায় প্রমাণিত হলো রামমন্দির আন্দোলন ছিল অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। জাতীয় স্তরের নেতৃত্বের এই আন্দোলন যে সত্য ও ন্যায়ের পথকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে তা ঐতিহাসিক রায় থেকেই বোঝা যায়। এত দীর্ঘ সময় ধরে কোনো আইনি লড়াইয়ের নিদর্শন বিশ্বে মনে হয় আর নেই। দীর্ঘদিন নানাবিধ অজুহাতে বারংবার এই রায়দান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ ধৈর্য ও শৌর্যের পরিচয় দেয়। আর উন্নত শিরে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে থাকে। রামন্দির আন্দোলন এর অন্যতম উদাহরণ। হতাশায় নিরুদ্যমে হিন্দু সমাজ কখনো ভেঙে পড়েনি। এই আন্দোলন শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে। কারণ সারা বিশ্বেই রামজন্মভূমি ঘিরে হিন্দু ধর্মের মূল্যবোধ, সহনশীলতা এবং আধ্যাত্মিকতা জড়িয়ে আছে। এই অযোধ্যার রামমন্দিরের আন্দোলনে অন্যতম হলো জনজাগরণের কর্মসূচি। এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল রথযাত্রা। কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশে হিন্দু জাগরণ বিরাট আকার ধারণ করে। পরবর্তী সময়ে করসেবার আহ্বান জানালে হাজার হাজার করসেবক অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হলে তৎকালীন সরকার করসেবকদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রার গতি রোধ করা হয়। এরপর ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর পুনরায় প্রতীকি করসেবার দিন ঠিক করা হলে রামজন্মভূমি নিয়ে চলা মামলার রায় নির্ধারিত ৩ ডিসেম্বর থেকে পিছিয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হয়। কিন্তু করসেবকদের

আটকানো যায়নি। বিতর্কিত ধাঁচা ধ্বংস করে রামলালাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এই কর্মসূচির ফলে বঙ্গপ্রদেশের কোঠারি ভাইদের আত্মবলিদান হিন্দু জনমানসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রমাণিত হয় যে ন্যায্য অধিকার ও ভাবাবেগের স্রোতকে রুদ্ধ করে রাখা যায় না। তবে এখন আর আন্দোলন নয়। রামজন্মভূমি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার রায়ে হিন্দুদের মর্যাদা ও ন্যায়ের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ দিনের বিতর্ক ও সমস্যার অবসান হয়েছে। রামমন্দির তৈরির পথ প্রশস্ত হয়েছে। ৫ আগস্ট ভূমিপূজোর মধ্য দিয়ে তার শুভ সূচনা করেছেন জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্য দিয়েই সারা দেশের জন্য নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো তা বলা যায়। সারা বিশ্বের কাছে এক উদাহরণ হয়ে থাকবে এই রামজন্মভূমির ইতিহাস। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের মতো সত্য আর কেউ নয়। তাই আদালতের ঐতিহাসিক রায় আসলে জাতীয়তাবাদের জয়, সত্যের জয়, বাস্তবতার জয়। কথাতেই তো আছে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

## অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করার মারাত্মক ফল

আমরা অবশ্যই অতীতকে বিস্মৃত হব না। আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পথ চলা স্থির করব। তবে অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকব না। আমরা হিন্দুরা কিন্তু অতীত থেকে কোনো শিক্ষাই নিইনি। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু প্রদেশ দখল, রাজা দাহিরকে হত্যা এবং হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার এবং ১০০০ সালে গজনির সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ এবং নির্মম অত্যাচারের ঘটনা থেকে হিন্দুরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরিকে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে দিল্লি ও আজমিরের অধিপতি পৃথ্বীরাজ পরাজিত চৌহান বন্দি মহম্মদ ঘোরিকে মুক্তি না দিতেন তাহলে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত এবং নৃশংসভাবে নিহত হতে হতো না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতো এক লম্পট যার লাম্পট্যের কারণে হিন্দু মহিলারা গঙ্গা স্নানে যেতে পারত না, কারণ সিরাজের অনুচররা গঙ্গাবক্ষে নৌকা নিয়ে টহল দিত, সুন্দরী কোনও হিন্দু তরুণীকে দেখলে তাকে বলপূর্বক নৌকাতে তুলে নিয়ে সিরাজের হারেমে পৌঁছে দিত। এই নরাধম সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে আমাদের এখনও কত আদিখ্যেতা। সিরাজকে নিয়ে নাটক হয় আর হিন্দুরা পরম আগ্রহে সেই নাটক দেখে থাকে। শুনেছি কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে সিরাজের নামে। ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের নামে কলকাতায় এবং নোয়াখালি জেনোসাইড নামে নোয়াখালিতে যে গণহত্যা ও অত্যাচার হয়েছিল আমরা হিন্দুরা তার থেকে কোনও শিক্ষা না নিয়ে 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' করছি ও গান ধরেছি 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।' ফলে বাংলাদেশে হিন্দুরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে চলেছে। হিন্দুকন্যা অপহরণ, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরকরণ প্রায়ই ঘটে চলেছে। হিন্দু সম্পত্তি গ্রাস করা, দেবালয় কলুষিত করা, প্রতিমা ভাঙা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। এসব ঘটনা থেকে পশ্চিমবঙ্গও মুক্ত নয়। বরং বলা যেতে পারে এদের দাপট দিনকে দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে কারণ বেআইনি এবং বেপরোয়া ভাবে পশ্চিমবঙ্গে এদের অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। ধুলাগড়, বাদুড়িয়া, নলিয়াখালি জীবনতলা, কালিয়াচক, কামদুনি-সহ বিভিন্ন স্থানে এরা বেপরোয়া ভাবে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, অপরাধীরা ধরা পড়ছে না কোনও অজ্ঞাত কারণে। সম্ভবত কিছু রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় থাকায় তাদের প্রশ্রয়ে। ফলে এদের সাহস আর বেপরোয়া মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের নিকটবর্তী কামদুনির দ্বিতীয় বর্ষের একটি কলেজ ছাত্রীকে কলেজে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে গ্রামের রাস্তায় নির্জনে একা পেয়ে যেভাবে নৃশংস অত্যাচার করে পা মুচড়িয়ে ভেঙে ছাত্রীটিকে হত্যা করেছিল তা চিন্তা করলেও শিউরে উঠতে হয়। পরে দুষ্কৃতীরা ধরা পড়লেও তাদের সাহায্য করতে কয়েকটি রাজনৈতিক দল আসরে নেমে পড়ে। বিচার ব্যবস্থা এত ধীর গতিতে চলতে থাকে তা চিন্তার বাইরে। অপরাধীদের সাজা ঘোষিত হলেও অপরাধীরা উচ্চ আদালতে সুবিচারের আশায় আপিল করেছে। শুনেছি অপরাধীদের অনেকে এখনও পরমানন্দে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ও সুবিচার প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক এদের জন্য অশ্রুপাত করে চলেছে যাতে এদের কোনও কঠিন সাজা পেতে না হয়।

ফলে এদের সাহস দিন দিন বেড়ে চলেছে। কামদুনিতে একটি কলেজ ছাত্রীর ওপর অত্যাচার করে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল কয়েকজন দুষ্কৃতী। বহু ক্ষেত্রেই তারা ধরা পড়ে না। ধরা পড়লেও বিচার ধীর গতিতে এগোয়। ফলে দুষ্কৃতীরা পরমানন্দে ঘুরে বেড়ায়। অভিযুক্ত হলেও উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ পায়। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা দুষ্কৃতী ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য অবিরাম অশ্রুপাত করে চলে, যাতে এদের সাজা না হয়।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
বড়বাজার, চন্দননগর, হুগলী।

# মধ্যযুগের ইউরোপে নারী ছিল শয়তানের কল

**সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৮ মার্চ দিনটি বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু ভারতবাসী কেবলমাত্র ৮ মার্চ নারী দিবস পালন করে না, তারা প্রতিটি দিনকেই নারী দিবস হিসেবে মানে এবং অন্তঃকরণে বিশ্বাসও করে। কেউ আমাকে প্রশ্ন করতেই পারে কেন? স্বামী বিবেকানন্দের কথায় তার স্পষ্ট উত্তর আছে— 'মেয়েদের উন্নতি করতে পারো, তবে আশা আছে নইলে পশুজন্ম ঘুচবে না।' স্বামীজীর এই কথা শুধু তাঁর কথা নয়, প্রত্যেক ভারতবাসী স্বামীজীর এই বাণীকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে ঃ

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্ত তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।' (৩/৫৬)

অর্থাৎ 'যে সমাজে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেই সমাজ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আর যারা নারীদের যোগ্য সম্মান করে না, তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন, তার সবই নিষ্ফল হয়ে যায়।'

মনে রাখতে হবে, মনুসংহিতা যখন রচনা হয়, তখন আজকের মতো নারী স্বাধীনতার যুগ কিংবা বিশ্বায়নের যুগ ছিল না। সেই যুগে দাঁড়িয়ে একজন ভারতীয় এই শ্লোক সমগ্র মানবজাতিকে নিবেদন করছেন। বর্তমান যুগে নারী স্বাধীনতার বিষয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হচ্ছে। কিন্তু ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দ নাগাদ নারী স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সমালোচকরা বলবেন যে, 'নারী স্বাধীনতা' শব্দ বা এর সমার্থক শব্দ প্রাচীন ভারতের কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে? হয়তো আজকের ধারণা অনুযায়ী কোথাও 'নারী স্বাধীনতা' শব্দের উল্লেখ নেই কিন্তু যদি তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান ও তাদের অধিকারের চিত্র দেখা যায় তাহলেই বোঝা যাবে যে, নারী স্বাধীনতা ছিল এবং কীরূপে ছিল। বৈদিক যুগে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে বসে বেদ পাঠ করতেন। তাদের পুরুষদের মতো উপনয়ন হতো, বিবাহযোগ্যা হলে নিজ ইচ্ছায় পতি নির্বাচন করতে পারতেন এবং তৎকালীন সময়ে নারীদের স্বয়ংম্বর সভার মধ্য থেকে পাত্র খুঁজে নেওয়ার অধিকার ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে নারীদের বেশকিছু অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু এর বিভিন্ন কারণও ছিল। সমাজপতিরা শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্য নারীদের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের অবস্থা সঙ্গীন করে তোলে। এরপর বহিরাগত তুর্কি আক্রমণে ভারতভূমি নরক হয়ে উঠতে থাকে। এর দরুন নারীদের জীবনে দুর্ভোগ তীব্র হয়। তার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলেও নারীদের দুর্দশা কমেনি উপরন্তু বেড়ে ছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে এসময়ও ভারতীয় মহাপুরুষগণ ভারতীয় নারীদের পুর্ণগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, রবিঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সারদা মা, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ। রবিঠাকুরের বাড়ি এবং তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে নারী স্বাধীনতার প্রতিফলন দেখা যায়। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ করেন এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন। স্বামীজী ও তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা নারী জাতির উন্নতির জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। সারদা মা নিরক্ষর মহিলা হওয়া সত্ত্বেও নারী স্বাধীনতার পক্ষে শুধু কথাই বলেননি, উপরন্তু তিনি ভগিনী নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ফর গালর্স স্কুলের উদ্বোধনও করেন। সমালোচকরা বলেন যে, ভারতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। তাদের উদ্দেশে বলা যায়, ভারতীয় সমাজ যদি পুরুষতান্ত্রিক হতো তাহলে তারা ভারতবর্ষকে কখনোই মাতৃরূপে দেখতো না। তারা দেশকে নারীর সঙ্গে তুলনা না করে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করত। এছাড়া ভারতীয়রা— 'মাতৃ দেব ভবোঃ, পিতৃ দেব ভবোঃ, আচার্য দেব ভবোঃ' শ্লোকটিতে প্রথমে 'মাতৃ দেবভবোঃ' না বলে 'পিতৃ দেব ভবোঃ' বলত।

সাম্প্রতিককালে কিছু ব্যক্তি মনে করেন, যা কিছু ভালো আছে তা সব পাশ্চাত্য দেশগুলির অবদান। অবাক লাগে , ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

একবার অধ্যয়ন করলেই এর সত্যতা জানা যাবে। পাশ্চাত্যে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ক্রিশ মিডলটন বলেছেন যে, পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই মহিলাদের জীবন অতিবাহিত হতো। সমাজে বিভিন্ন বিধিনিষেধ মহিলাদের ওপর আরোপিত হতো। ইংল্যান্ডে কৃষক মহিলাদের জমির উপর কোনো অধিকার ছিল না। ব্রিটিশরা নিজেদের সভ্য মনে করে কিন্তু সেখানে নারীদেরই কোনো মর্যাদা ছিল না। মধ্যযুগের ইউরোপে নারীদের দুটি জীবন বেছে নিতে হতো, হয় তারা বিবাহ করবে, নয় তারা সন্ন্যাসিনী হবে। এ জীবন স্বেচ্ছায় তারা বেছে নিত না, তাদের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া হতো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভয়ংকর অত্যাচার করা হতো নারীদের ওপর। ইউরোপে ডাইনি অপবাদে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, যাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী। এই যে বীভৎস হত্যাকাণ্ডকে ইতিহাসে Genderized Mass Murder বলা হয়। এই হত্যাকাণ্ড চলে ১৪৮০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ অবধি। ২৭০ বছরের এই সময়কালে ৪০ হাজার থেকে ১১ লক্ষ নারীকে হত্যা করা হয়। সে সময় নারীদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল, Women are by nature instruments of Satan– they are by nature carnal A structural defect rooted in the original creation'।

ভাবতে অবাক লাগে, এরাই আবার নারী স্বাধীনতার প্রবর্তক বলে নিজেদের দাবি করে। নারী স্বাধীনতার অন্যতম অঙ্গ হলো তাদের ভোটদানের বিষয়। ভারতে সংবিধান চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীরা ভোটদানের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নারীদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করতে হয়। এর থেকে পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার নামে ভণ্ডামির চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। বর্তমানে ভারতের যুবসমাজ পাশ্চাত্যের 'valgar culture'-কে অনুকরণ করা শুরু করেছে। ভাবতে দুঃখ হয় যে, ভারতের মতো মহান দেশের সন্তান হয়ে তারা কীভাবে এগুলিকে গ্রহণ করছে? কেবল তাদের শুধু দোষ দিলে মিথ্যাচার হবে, এর পেছনে রয়েছে বিভিন্ন অসাধু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

এর ফলে ভারতে বর্তমানে নারী জাতির অবক্ষয় ঘটছে। নারী ও পুরুষ নিজেদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা না করে নারী জাতির অবক্ষয়ের মূল কারণের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সেই সব অপসংস্কৃতিকে সমাজ থেকে দূরে ফেলার কাজে ব্রতী হতে হবে। ভারতীয় নারী ও পুরুষদের মধ্যে দৈবী ও দৈব সত্তা নিহিত আছে। সেই সত্তাকে জাগ্রত করে সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির ধারাকে সমাজে বহমান রাখতে হবে। ▫

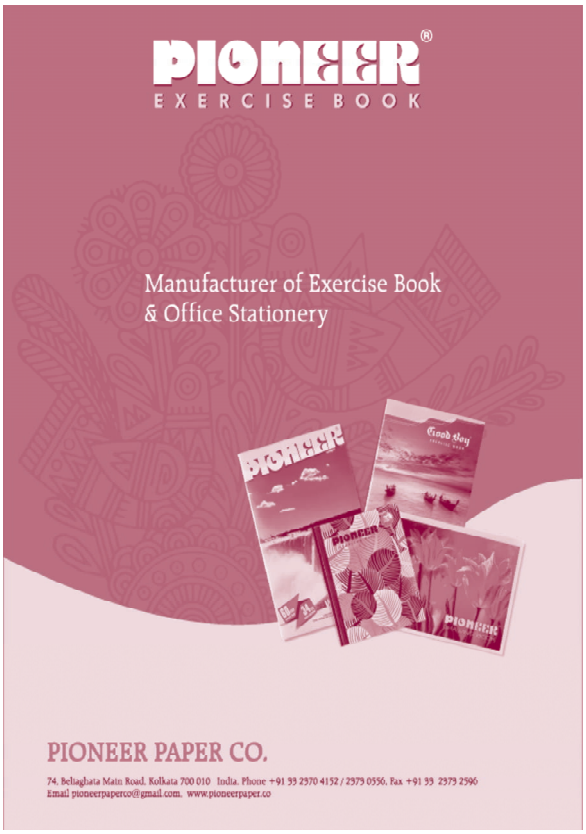

জম্মু-কাশ্মীরের তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লা দখলদার বাহিনীর হাতে থাকা জমিগুলিকে অবৈধ উপায়ে দখল করার পরিকল্পনা করেন।

# কাশ্মীরে পণ্ডিতদের জমিচুরিতে সবচেয়ে লাভবান ফারুখ আবদুল্লা

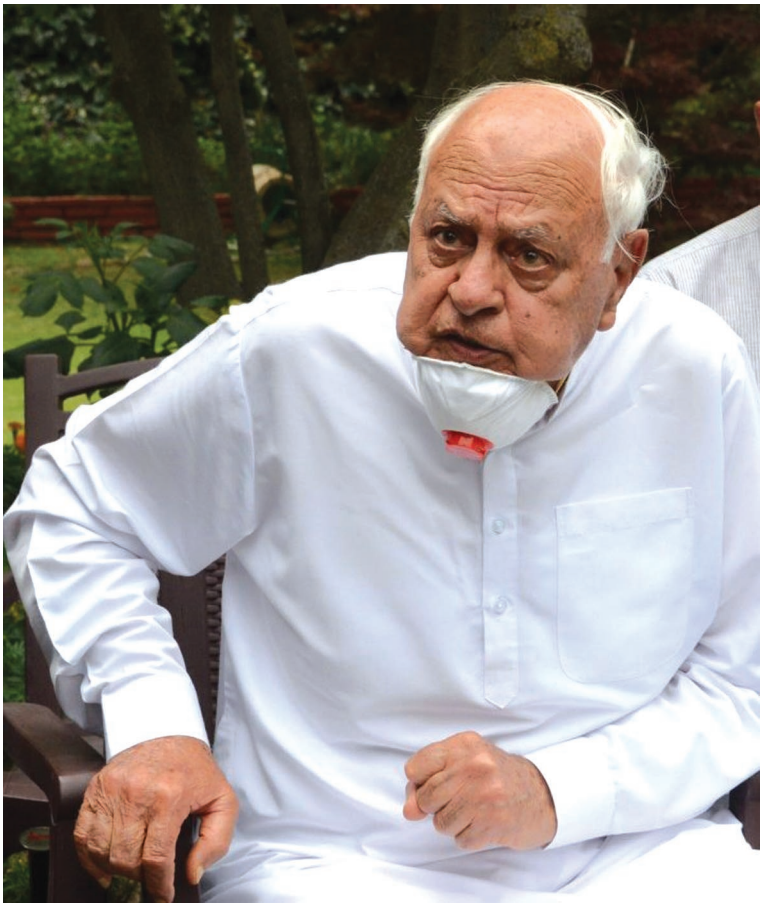

**ড. নারায়ণ চক্রবর্তী**

**পটভূমি :**

১৯৭৫-৭৬ সাল নাগাদ জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সংবিধান সংশোধন করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সাম্যবাদী' এই দুটি শব্দ সংবিধানের মুখবন্ধে জুড়ে দেওয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারত-বিরোধী শক্তি ও তাদের স্বাভাবিক বন্ধু ভারতীয় কমিউনিস্ট দলগুলি দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে উৎসাহ পায়। এই সময় জম্মু- কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা। তিনি প্রাথমিক ভাবে একজন হিন্দু-বিদ্বেষী, ইসলামি মৌলবাদী নেতা। এর অকাট্য প্রমাণ তাঁর ১৯৩০ সাল নাগাদ দেওয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতাগুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরে রহস্যজনক মৃত্যুর পর সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন শেখ আবদুল্লা। তিনি তখন ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কখনোই জম্মু-কাশ্মীরকে দেশের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে মানতে চাইতেন না। সর্বদা সুযোগ খুঁজতেন, কী করে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী অবস্থানের প্রেক্ষিতে জম্মু-কাশ্মীরকে পাকিস্তানের পাশে নেওয়া যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম-তোষণ নীতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লা তাঁর ধর্মীয় জেহাদের প্রচার জোরদার করলেন। যদিও ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ওই সময় নির্বাচন কমিশনের এই ধর্মবিদ্বেষী রাজনীতিকে ভোটযুদ্ধে মান্যতা দেওয়ার কথা নয়, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন চোখ- কান বন্ধ রেখে এই ধর্মীয় উন্মাদনার মাধ্যমে দেশবিরোধী কাজকে পরোক্ষভাবে মদত জোগালেন।

এর অবিসংবাদী ফল হলো জম্মু-কাশ্মীর সরকারের কর্ণধার শেখ আবদুল্লা তাঁর পাকিস্তান প্রীতির কারণে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ও ভোটের রাজনীতির সংখ্যাতত্ত্বে সুবিধা নিতে হিন্দু-বিদ্বেষী অবস্থান নিতে লাগলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের সংগঠন এই হিন্দু বিদ্বেষী রাজনীতির পরিধি দ্রুত বাড়াতে লাগল। হিন্দুদের 'মুখবির' অর্থাৎ ভারতের গুপ্তচর হিসেবে অভিহিত করা হতে লাগল। উপত্যকায় রাজনীতিকদের চুরি ও অসততার সঙ্গে হিন্দু-বিদ্বেষের মাপকাঠি ভালো পোস্টিং-এর সহায়ক হওয়ায় রাজ্যের প্রশাসন ধীরে ধীরে অযোগ্য, অসৎ ও সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়তে লাগল। এর থেকে উদ্ভূত জনমানসের ক্ষোভকে ন্যাশনাল কনফারেন্স-সহ উপত্যকার সমস্ত রাজনৈতিক দল হিন্দুদের ও ভারত সরকারের দিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হলো। এতে ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস দল পড়ল বিপদে। ইতিমধ্যে আফগান জিহাদ, ইরানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পালাবদল এবং খালিস্তানি আন্দোলন, কাশ্মীরি

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত জোগাল। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান আইএসআই-কে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তি জোগাতে ব্যবহার করতে লাগল। ১৯৬৫-সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে তারা শুভবুদ্ধি প্রয়োগ না করে জেহাদি মানসিকতায় প্রতিহিংসার আগুনে ভারতকে টুকরো করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করল। পাকিস্তান কাশ্মীরি মুসলমানদের সুফিমতবাদের জায়গায় ওয়াহাবি মতবাদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করল, কারণ তার ফলে কাশ্মীরি মুসলমানরা পাকিস্তানের সঙ্গে ধর্মীয় একাত্মতা অনুভব করবে। ১৯৮২-র ৮ সেপ্টেম্বর শেখ আবদুল্লার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ফারুখ আবদুল্লা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনিও পিতার নীতির অনুসারী হলে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৪-র ২ জুলাই ফারুখের বোনের স্বামী জিএম শাহকে কংগ্রেসের মদতে ওই রাজ্যের শীর্ষপদে বসালেন। এটি একটি বিপর্যয়কারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই ঘটনাকে ফারুখ রাজ্যবাসীর সঙ্গে কেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে প্রচার করলেন এবং কংগ্রেস বিরোধিতাকে কাশ্মীরি অস্মিতার সঙ্গে যুক্ত করে ভারত বিরোধিতায় নিয়ে গেলেন। ফলে, জেকেএলএফ-সহ অন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি অক্সিজেন পেল এবং প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স ও পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি উভয়কেই তাদের সুপ্ত ভারত-বিরোধী অ্যাজেন্ডা সামনে আনতে সাহায্য করল।

এরপর ধীরে ধীরে উপত্যকার রাজনীতির মূল স্রোতকে যে কটি জিনিস সবচেয়ে প্রভাবিত করল তাহলো, ইসলামিকরণ, শরিয়ত আইন প্রণয়ন এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের প্রয়াস। ততদিনে স্পষ্ট হয়ে গেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স যে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছে তার থেকে নামার সাহস তাদের আর নেই। এর মধ্যে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনের ব্যটন চলে গেল উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে। ফলে, ১৯৮৯ সাল থেকে হিন্দুশূন্য করার ঘৃণ্য চক্রান্তের রূপায়ণ শুরু হলো। স্বাধীনতার অব্যবহিতপূর্বে

**কাশ্মীর উপত্যকায় যখন হিন্দু-শিখ রমণীদের নির্বিচারে ধর্ষণ ও গণহত্যা শুরু হলো, আশ্চর্য ভাবে সিপিএম ও অন্য কমিউনিস্ট দলগুলি তখন কোনো সাহায্য তো করলই না, বরঞ্চ ওই সময় কলকাতায় তারা নিকারাগুয়ার প্রতিবিপ্লবীদের জন্য অর্থ তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এভাবেই দেশের কমিউনিস্টরা নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থকের পর্যায়ে নিয়ে গেল।**

আমরা বাঙ্গলা ও পঞ্জাবে যে কায়দায় হিন্দু নিধন, নারীধর্ষণ এবং বিতাড়ন চলেছে, তা উপত্যাকায় শুরু হলো। কাশ্মীরি হিন্দুদের, যাদের কাশ্মীরি পণ্ডিত নামে অভিহিত করা হয়, তার উপর অত্যাচারের পরিণতিতে ১৯৮৯ সালের পূর্বে যেখানে ৩ থেকে ৬ লক্ষ হিন্দু ও শিখ ছিলেন, তাঁদের সংখ্যাটা ২ থেকে ৩ হাজারে নেমে এল। হিন্দু রমণীদের নির্বিচারে ধর্ষণ ও গণহত্যার পর দলে দলে হিন্দু ও শিখরা ভারতের অন্যান্য স্থানে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হলেন। দিল্লি-সহ বহু জায়গায় তাঁদের শিবির করা হলো। আরএসএস-সহ অন্য কিছু সংগঠন এদের খাবার দাবার ও ওষুধপত্র জোগান দিতে এগিয়ে এল। আশ্চর্য ভাবে সিপিএম ও অন্য কমিউনিস্ট দলগুলি কোনো সাহায্য তো করলই না, বরঞ্চ ওই সময় কলকাতায় তারা নিকারাগুয়ার প্রতিবিপ্লবীদের জন্য অর্থ তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এভাবেই দেশের কমিউনিস্টরা নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থকের পর্যায়ে নিয়ে গেল। এরপর ওই লুঠপাট করা জমি-সহ হিন্দুদের সম্পত্তির দখল নিতে থাকে ওই লুঠেরা বাহিনী। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হলো সেদেশে ট্রেনিং নেওয়া জঙ্গিদের উপত্যকায় অনুপ্রবেশ করানো। উদ্দেশ্য নাশকতায় সরসরি অংশগ্রহণ ও পাকিস্তানে তৈরি প্রচারপুস্তিকায় ভারত ও হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো, সঙ্গে নাশকতাকে আল্লার ফর্জ বলে চালানো। শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে সাধারণ কাশ্মীরি মুসলমানদের একটা অংশ এই ফাঁদে ধরা দিল এবং হিন্দু বিতাড়নের পর তাদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে হতে লাগল। এই সময় অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার আসার পর অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। এর মূল কারণ উপত্যকার দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের ভোটের কারণে ও পাকিস্তানের সঙ্গে ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে এই অরাজকতাকে সমর্থন করে।

**অ্যাক্ট ও তার বিলোপ :**

এমন পরিস্থিতিতে জম্মু-কাশ্মীরের তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লা দখলদার বাহিনীর হাতে থাকা জমিগুলিকে অবৈধ উপায়ে দখল করার পরিকল্পনা করলেন। তিনি এইসব ছোটো জমির দখলদারদের জমির মালিকানা (দখলিকৃত ও বৈধ কাগজপত্র ছাড়া) প্রদান করার জন্য একটি রাজ্য-আইন প্রণয়ন করলেন। ২০০১ সালে এই আইনটি, vesting of ownership to occupants act (to regularize the un-authorized occupants) চালু হলো। বাহ্যিক ভাবে ১০১ টাকার বিনিময়ে এই জমি যা অন্য লোকেদের তাড়িয়ে দিয়ে জবরদখল করা হয়েছিল, সেই জবরদখলকারীদের

হাতেই তুলে দেওয়ার কথা হলো। গোড়া থেকেই এটি বেআইনি। কিন্তু ফারুখের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তিনি আপাত দৃষ্টিতে দেখালেন যে এই জমি থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তার পরিমাণ পঁচিশ হাজার কোটি। বলা হলো এই সংগৃহীত অর্থে বিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়ন করে উপত্যকার মানুষের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হবে। এই রোশনি পাওয়ার থেকেই এর চলতি নাম হলো রোশনি অ্যাক্ট।

যেহেতু ১৯৫০ সালে দেশের জমি আইন গৃহীত হয়েছে, তার জন্য পণ্ডিতদের বিতাড়নের পর তাঁদের জমি অধিগ্রহণের জন্য ফারুখ ১৯৯০ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরলেন। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। হিন্দু বিতাড়ন ও জমি লুণ্ঠন। কিন্তু গোলমাল বাধালো অতিরিক্ত লোভ। দেখা গেল পঁচিশ হাজার কোটির জায়গায় পাওয়া গেছে মাত্র ছিয়াত্তর কোটি টাকা।। কেন এমন হলো? ইতিমধ্যে ২০০২ সালে ফারুখ ভোটে হেরে যাওয়ার পরে কংগ্রেস-পিডিপি সরকার ক্ষমতায় এল। মুফতি মহম্মদ সৈয়দ ভিত্তিবর্ষকে ১৯৯০ থেকে ২০০৪-এ এগিয়ে আনলেন যাতে নতুন নাম যোগ করা যায়। এরপর কংগ্রেসের গুলাম নবি আজাদ ২০০৫-এ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এই সময়কে আরও পিছিয়ে ২০০৭ করলেন।

২০১৪ সালে সিএজি এই অ্যাক্টকে এক বিশাল ঘোটালা (স্ক্যাম) আখ্যা দেয়। ২০ জন সরকারি অফিসারের গাফিলতি ধরা পড়ে। রাজ্য সরকার কারোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ করে না। এই যে ফি এর বিনিময়ে দখলীকৃত জমি দখলদারদের কেন দেওয়া হলো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু তাঁর চেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে উঠে এলো ক্ষমতাশীল মানুষদের জমি আত্মসাৎ করার ঘটনা। প্রথমত, লুঠের মালের বখরার যেমন কোনো আইনি শনাক্তকরণ করা যায় না, তেমনই ওই মালিকানা যাদের নামে দেওয়া হলো তারা জমির মালিকানা পাওয়ার পর তা অন্যের নামে বেচে দিল। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই জমি দখলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছেন ফারুখ আবদুল্লা ও তাঁর পরিবারপরিজন। এছাড়া লাভবান হয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী হাসিবদ্রাবু এবং তাঁর পরিবার, কংগ্রেস নেতা মাজিদওয়ানি, এনসি নেতা সাজ্জাদ কিচলু। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান এমওয়াই খান ও আইএএস অফিসার মহম্মদ সফি পণ্ডিতের স্ত্রী নিঘাত পণ্ডিত। ২০১৮ সালে রাজ্য হাইকোর্ট এই জমিগুলির বর্তমান মালিকদের জমি বিক্রি, বদল, হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ওই বছরেই রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক এই অ্যাক্ট বাতিলের সুপারিশ করেন ও সিবিআই এনকোয়ারির নির্দেশ দেন। ২০২০ সালের অক্টোবরে হাইকোর্ট রাজ্যপালের নির্দেশের সঙ্গে সহমত পোষণ করে। তারপর এই অ্যাক্টকে ২০২০-র ১ নভেম্বর আইনমোতাবেক বাতিল করা হয় এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত জমি ১৯৯০ সালের আগের মালিকদের হাতে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। সব 'চোর মচায়ে শোর' চেঁচামেচি— ইসলাম গেল গেল রব তুলেও যখন কিছু করতে পারল না তখন মামলা করে প্রচেষ্টায় বিলম্ব করার ও নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগল। রাজনীতিকরা একে অন্যকে বেশি চুরি করার অভিযোগ করতে লাগল। আইনটা বাতিল করার জন্য সম্প্রতি আইএএস সফি পণ্ডিত হাইকোর্টে মামলা করেছে। আসলে নিজেকে ও স্ত্রীকে বাঁচানোর চেষ্টা। এ ব্যাপারে শেষে কিছু বক্তব্য আছে। এই যে কাশ্মীরের জনসাধারণকে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের মধ্যে রেখে তাদের ধর্মের আফিম খাইয়ে, বিদ্বেষ, বিভেদ ও বিচ্ছেদের রাজনীতি করে বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক পরিবার দেশের সম্পদ লুঠ করে এবং দেশে বিদ্বেষের হাওয়া তৈরি করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করল— একে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন জোগাচ্ছে কমিউনিস্টরা। যখন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণ এবং তাদের বিতাড়ন চলছিল তখন দেশের কমিউনিস্ট দলগুলি তার কোনো প্রতিবাদ করেনি। এমনকী এখনো তারা 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' গ্যাংকে পূর্ণ মদত ও রাজনৈতিক অক্সিজেন জুগিয়ে চলেছে। ফলে, জাতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট দলগুলির প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হচ্ছে। যত সময় এগোচ্ছে, সাধারণ কাশ্মীরিরা এই কৌশল বুঝতে পেরে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার শরিক হচ্ছেন— এটাই আশার কথা। ▯

## বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন।

*—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

এখন থেকে 'প্রণব' পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যাবে—
www.bsspronabpub.com
প্রণব সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য
ব্যবহার করুন—
swamivedanandamaharaj@gmail.com
maharajswaminirmalananda@gmail.com

# লোকশিল্পের চাহিদা বাড়লে উপকৃত হবে অসংগঠিত ক্ষেত্র

**চূড়ামণি হাটি**

'এ কাজে লাভ নেই তবু ছাড়তেও পারি না'— এমন ধরনের কথা লোকশিল্পীরাই বলতে পারেন। বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে শেখা বিদ্যায় সুখ থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতি দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেন এ বিদ্যের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এ বিদ্যের চাহিদা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল তাকে ঘিরে থাকা পরিবেশটির উপর। অর্থাৎ তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। যে ভূমির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেই ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সংস্কৃতির নিজস্ব উপাদানগুলিকে ভালোবাসা বা না-ভালোবাসার উপর দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যাশ্রিত শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ। না-ভালোবাসার জায়গা থেকে তৈরি হওয়া শূন্যস্থানকে কাজে লাগাতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে বড়ো মাপের আর্থিক পরিকাঠামো নিয়ে তৈরি বাণিজ্যিক শক্তিগুলি। আমরাই বাণিজ্যিক শক্তিগুলির দেখানো লোভের বশবর্তী হয়ে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি। এমনকী পরম্পরাগত চর্চার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাণিজ্যিক শক্তিগুলির তৈরি করা ফাঁদে পা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন স্বয়ং লোকশিল্পীরাই। এই চক্রে লোকশিল্পীরা বাপ-ঠাকুরদার কাজকে শেষ প্রণাম জানিয়ে শিল্পীর মর্যাদা হারিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মী রূপে চিহ্নিত হচ্ছেন। সুখের জিনিসটি তৈরির ক্ষমতা নিয়েও অসহায়। নতুন কিছু ভাবতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছেন লোকশিল্পীরা।

প্রয়োজন থেকে শিল্পের জন্ম। পরবর্তী পর্যায়ে যুক্ত হয়েছে নান্দনিক সৃজনশীল প্রকাশ। বংশপরম্পরাগত পদ্ধতি, কৌশল, দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পীদের লক্ষ্য প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শিল্পবস্তুটি তৈরি করা। ঘরে বা ঘর লাগোয়া স্থান নির্বাচন করেই এ কাজগুলি হয়েছে। যে কারণে লোকশিল্পের ও হস্তশিল্পের আর এক পরিচিতি কুটির শিল্প হিসেবে। বলাবাহুল্য সমস্ত লোকশিল্প হস্তশিল্প কিন্তু সমস্ত হস্তশিল্প লোকশিল্প নয়। যাইহোক কিছু কুটির শিল্প তার উৎপাদন স্থলকে সরিয়ে নিয়ে গেছে বাজার সংলগ্ন স্থানে। বদলে যাওয়া অর্থনীতির মানচিত্রে এও এক ধরনের চেনা ছবির বদল। একদল শিল্পী তাদের প্রয়োজনে ঘটিয়েছে। চাহিদা ও জোগানের দ্রুত ভারসাম্য রক্ষার জন্য। কিন্তু যে বদল পরম্পরাগত চর্চাকে ভাবিয়ে তোলে তা লোকশিল্পীদের পক্ষে সুখের বার্তা দেয় না। নিজস্ব সংস্কৃতির ভাঙন তাই লোকশিল্পীদের কাছে বড্ড ভয়ের। ভালোবাসা নয়; এই ভয়কেই সামনে রেখে লোকশিল্পীদের কাছে টেনে নেয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি। কর্মী হয়ে তাদের দেখানো পথে নিজস্ব চর্চার বদল ঘটিয়ে বাঁচার চেষ্টা। নানা মাধ্যমকে সামনে রেখে বা কাজে লাগিয়ে ঘটিয়ে দেওয়া রুচির পরিবর্তনকে কাছে লোকশিল্পের নিজস্ব তেজ বা রস বড্ড অসহায়। বাণিজ্যিক শক্তির কাছে লোকশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ফুরালেও নান্দনিকতার মোড়কে লোকশিল্পের সরল প্রকাশ সৌখিন চর্চার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। যার ক্রেতা সমাজের উচ্চশ্রেণী। আর এই উচ্চ শ্রেণীর কাছে পৌঁছানোর জন্য তৈরি হয়েছে বেশ কিছু বাবু , ম্যাডাম বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। লোকশিল্পীদের মানসিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এই বাবু-ম্যাডামরা উচ্চশ্রেণীর বিলাসিতার কথা ভেবে নিজের খেয়ালে বিক্রয়মূল্য স্থির করেন আর শিল্পীদের অসহায় করে রেখে অল্পতেই খুশি করেন। লোকশিল্পীদের সুখ-দুঃখ কিছুই গুরুত্ব পায় না।

লোকশিল্পীদের চেহারা বা তাদের জীবন ধারণের ছবি দেখে একশ্রেণী কাঁদেন ঠিকই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ কান্না মন থেকে নয়, ভাষায়। এ ভাষা সেজে ওঠে কিছু আলোকচিত্র নিয়ে। গবেষণার প্রয়োজনে। সরকারি-বেসরকারি স্তরে কিছু কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে। মুখোশধারী এই হাঁ-মুখগুলো

লোকশিল্পীর কাছে আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে প্রশাসনিক শক্তির একটি স্তর হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে। প্রশাসনিক শক্তির সংস্পর্শে থাকার মোহ নিয়ে লোকশিল্পীরাও নিজেদের অসহায় মনে করে সঙ্গ দেন। সব হারানোর ভয় নিয়ে এ সংস্থগুলিও কখনোই চায. না লোকশিল্পীদের মাথা উঁচু হোক। আয়োজনের ঢক্কানিনাদে সংস্থাগুলির নাম উজ্জ্বল হয় কিন্তু শিল্পীরা সহজাত স্বভাব ভঙ্গিতে কর্মী হয়েই থেকে যায়। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিল্পীদের সহজাত স্বভাবভঙ্গিকেই কাজে লাগায় ওই সংস্থাগুলি। একদিকে সরকারি বা জনগণের অর্থ খরচের ক্ষমতা আর অন্যদিকে লোকশিল্পীদের কাছে নিজেদের অফিসার হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা; এই দুইয়ের সংযোগ সাধনের মূল উদ্যেশ্যই অর্থ উপার্জন। যার অর্থ সঠিক আর্থিক সহযোগিতা লোকশিল্পীদের কাছে পৌঁছায় না। লোকশিল্পীদের প্রশ্ন করা হলে বলে, 'অফিসারদের ব্যবহার ভালো তাই আসি'। সরলতা গুণে তারা বিশ্বাস করে। তাদের দেখানো রাস্তায় ছুটতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু বুঝতে পারে না ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। নিরস্ত্র হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব কর্মদক্ষতার পরাজয় হচ্ছে। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ডিজাইনারদের গুরুত্ব বাড়ছে; সরকারি অর্থে পুষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে গুরুত্ব ওই সংস্থাগুলির; আর লোকশিল্পীরা ক্রমশ শিল্পীসম্মান হারিয়ে কর্মীতে পরিণত হচ্ছে। লোকশিল্পীরা যেমন শিল্পী তেমন বিক্রেতাও। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে লোকশিল্পীরা হচ্ছেন শুধুমাত্র কর্মী। অর্থাৎ অর্থনীতির একটি বড়ো কাঠামো থেকে লোকশিল্পীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ক্রমশ সরাসরি বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা লোকশিল্পীদের দুঃখের কারণ।

লোকশিল্পীদের দুঃখ ঘোচানোর জন্য কোনো সরকারি সাহায্যে পুষ্ট মধ্যস্থতাকারী সংস্থার প্রয়োজন নেই। সরকারি উদ্যোগে সংস্কৃতির নানা মাধ্যমকে ঐতিহ্যের ধারায় বাঁধলেই লোকশিল্পীদের তৈরি শিল্পবস্তুটি আপন সংস্কৃতির পরিচয় নিয়ে ধরা পড়বে। লোকশিল্পীদের আগন্তুক না ভেবে যদি কিছু নিয়মনীতি তৈরি করে সর্বত্র ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া যায়, তাহলেও একটি সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে শর্তসাপক্ষে সাহায্য করলেও মন্দ হয় না। এ সহযোগিতা হলো বিশ্ববাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা। ক্ষুদ্র বাজারকে স্বদেশি ভাবনার আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে লোকশিল্পের চাহিদা তৈরির চেষ্টা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসংস্থানই পারে আমাদের সামাজিক চিত্রকে বদলে দিতে। নিজস্ব বাজারের চাহিদা তৈরির জন্য সাংস্কৃতিক জগতে ঐতিহ্যাশ্রিত ধারাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নিজস্ব সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিলে বাইরের সংস্কৃতি বাসা বাঁধতে পারে না। আবার নিজস্ব সংস্কৃতির রং চাপা পড়ে গেলে বিশ্বের কাছে তা প্রকাশ পাওয়ার সুযোগও থাকে না। আঞ্চলিক বাজার হারানোর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। প্রয়োজনের বস্তুটির বাজার চাহিদা বেশি কিন্তু নান্দনিকতার পরিচিতি নিয়ে থাকা বস্তুটির বাজার চাহিদা সীমিত। প্রয়োজনটি মেটাতে বিকল্প শিল্পবস্তুর উপস্থিতি ঘটলেও লোকশিল্পে নান্দনিকতার বিকল্প নেই। লোকশিল্পীদের কাছে এটাই একমাত্র আশার আলো।

লোকশিল্পের অখণ্ড রূপ খণ্ডিত হচ্ছে আমাদের ইচ্ছায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে। খণ্ড রূপের চর্চায় মজেছে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিতরা। প্রয়োজনে খণ্ড রূপের বিকৃতি ঘটছে। লোকশিল্পীরা বুঝতে পারছেন ক্রমশ তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। তবুও কেউ কেউ তাদের মেজাজ ধরে রাখতে

আনুষ্ঠানিক মঞ্চে আসা-যাওয়াকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ মঞ্চগুলিতে তাদের মুখে হাসি ধরা পড়লেও, বুকের ভেতর পরম্পরাগত চর্চার পরাজয়, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে খুব একট ভালো সংকেত নয়। নাতিপুতিরা দিনমজুর খাটে কিন্তু এ কাজ করে না। অর্থাৎ আগ্রহ কমেছে। কাজের মান পড়েছে। এমন একদিন আসবে বা এসে গেছে, যেদিন পড়ে যাওয়া কাজের মান বা ভাবনাগুলো তুলে ধরার কেউ থাকবে না। বাণিজ্যিক ভাবনা নিয়ে কিছু ব্যক্তি বা সংস্থা মজুরি বা সাম্মানিক দিয়ে লোকশিল্পীদের বংশধারাকে চালনা করবে। সরাসরি বাণিজক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে লোকশিল্পীরা হাহাকার করছে। সেই হাহাকারের সুযোগ নিচ্ছে সরাসরি বাণিজ্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকা সংস্থাগুলি।

লোকশিল্পীদের উন্নতির জন্য এ সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল না হওয়াই ভালো। এ সংস্থাগুলি সরকারি প্রকল্পের টাকা খরচ করার ক্ষমতা নিয়ে লোকশিল্পীদের অসহায় অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আলোর মধ্যে থাকা লোকশিল্পীদের আলো দেখিয়ে অন্ধকারে থাকা লোকশিল্পীদের ফাঁকি দিয়ে ব্যবসায়িক স্তরে নিজেদের পুঁজি বৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে। সরকারি কর্তা ও পয়সাওয়ালা একটি শ্রেণীর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা নিচ্ছেন। একমাত্র মেলাই হয়ে উঠেছে লোকশিল্পীদের কাছে জনসংযোগের মাধ্যম। কিন্তু কয়েকটি মেলা ছাড়া বেশিরভাগ মেলাতেই লৌকিক আবেগের সুর-তাল কেটেছে। একসময় ঘরের প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে মেলাগুলি ভিড় টানতো। শুধু রসনা নিয়ে নয়; হরেক রকমের খেলনার পশরা সাজিয়ে বাড়ির ছোটোদের মন অস্থির করে তুলতো। খুব সাধারণ আয়োজনে লোকশিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম নিয়ে স্থানটিকে জমজমাট করে তুলতো। মেলার এ চেহারাটিকে প্রভাবিত করছে লাগোয়া শহরগুলি। এ শহরগুলি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বৈদ্যুতিন বিনোদন মাধ্যমে ফুটে ওঠা ভোগ্য সামগ্রীগুলিকে। এভাবেই বদলে গেছে চাওয়া-পাওয়ার জগৎ। এই বদলে যাওয়া জগতকে সামনে রেখে লোকশিল্পীদের চর্চার বদল ঘটানো প্রয়োজন, নাকি সামাজিক জীবনযাত্রাকে বদলে দেওয়ার মাধ্যমগুলিকে বদলানোর প্রয়োজন— যুক্তি, পালটা যুক্তির অভাব নেই। কিন্তু যুক্তি পালটা যুক্তির উর্ধ্বে থেকে একথা স্পষ্ট, আমাদের অর্থনীতিকে শক্ত কাঠামো দেওয়ার জন্য লোকশিল্পীদের উন্নতি খুবই প্রয়োজন। এ জন্য বিনোদন মাধ্যম ও আমাদের সচেতন ভূমিকা বেশ গুরুত্ব সহকারেই দেখা উচিত। যে মাধ্যম ও বিশেষ ব্যক্তিত্বরা আমাদের প্রভাবিত করে, তাদেরই এ দায়িত্ব নিতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে পরম্পরাগত চর্চার মূলধারাটি টুকরো টুকরো হচ্ছে। নিজের সাংস্কৃতিক পরম্পরার উপর এতোটাই অশ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে, যার ফল আমরা আমাদের ঐতিহ্য থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, আধুনিকতার নামে ভিন অঞ্চলের সংস্কৃতি আমাদের প্রভাবিত করছে। ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মধ্যেও আমাদের শ্রদ্ধা অপেক্ষা বিলাসিতার মানসিকতাটাই বেশি কার্যকরী। যার ফল, যাদের উপর সরকারি স্তরে দায়িত্ব দেওয়া হয় তারাও বিশ্বাসের টুঁটি টিপে ধরে। অর্থাৎ এ ধরনের কর্মসূচিতে নিজেদের স্বার্থপূরণ বা সরকারি কর্তাদের সন্তুষ্ট করার দিকেই নজর থাকে। কিছু শর্তে অংশগ্রহণকারীদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা ও তাদের মূল্যবান স্বাক্ষর ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়। যেমন, একশো টাকা বেশি দিয়ে এক হাজার টাকার বেশি বিল তৈরির প্রস্তাব, কিছু টাকা রিটার্ন দিলে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক দেওয়ার শর্ত, এসব শুদ্ধ হয়ে যায় পরিচিত অডিটারের হাত ধরে। অর্থাৎ লোকশিল্পীদের ভালোর জন্য অর্থ ব্যয় হলেও বাস্তবে লোকশিল্পীরা পান খুবই সামান্য কিছু। শক্ত প্রশাসনিক কাঠামোই পারে লোকশিল্পীদের বাঁচাতে। শ্রদ্ধা ও সততাই পারে লোকশিল্পীদের বাঁচাতে। বর্তমান বাজারে লোকশিল্পীদের টিকে থাকার লড়াই লোকশিল্পীদেরই করতে হবে।

এজন্য প্রয়োজনে সরাসরি লোকশিল্পীদেরই সাহায্য করতে হবে। পাঠসূচিতে লোকশিল্প ও শিল্পীদের পরিচয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে ছোটো থেকে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারি। পর্যটন মানচিত্রে লোকশিল্পের পরিচয়ে পরিচিত কিছু গ্রামকে চিহ্নিত করতে হবে। লোকশিল্পীরা লোকশিল্পের মূলধারাটি টিকিয়ে রাখতে পারলে সর্বকালের জন্য তা সুন্দর। আধুনিকতার নামে যে সৌন্দর্যচর্চা তা কিছু দিনের চমক। চমকের চরিত্রই হলো ক্রমশ চরিত্র বদল। লোকশিল্পীরা এ দু ধারার মধ্যে থাকারও ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মূল ধারা থেকে সরে যাওয়া তাদের কাছে পরাজয় ছাড়া কিছু না। জনসমাগমের থেকে দূরে থেকেও তারা ঘরের ভেতর কম পুঁজি নিয়েও তাদের কাজ তারা চালিয়ে যেতে পারে। আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতা পেলে বিশ্ব বাজারকে প্রভাবিত করারও ক্ষমতা রাখে। জীবিকা অর্জন ও আয় সৃষ্টির এই লোকশিল্পের বাজারটি সচল থাকলে দারিদ্র দূরীকরণ ঘটার সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। পরিবেশের অনেক উপকরণ কাছে লাগায় কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পাবে। পাট, কার্পাস-সহ কৃষি ক্ষেত্রের একটি শ্রমগোষ্ঠীও উন্নতির আশা দেখবে।

একদিকে কৃষিকাজ দেখা আর অবসর সময়ে উঠনে বা বৈঠকখানায় বসে ঢ্যারা ঘুরিয়ে শন কাটা, একদিকে গৃহস্থালীর কাজ দেখা ও অবসর সময়ে কুশের কাজ বা সূঁচ-সুতো নিয়ে কাঁথা সেলাই করা—একসময় এসব ছিল চেনা ছবি। কুমোর পাড়া, কামার পাড়া, তাঁতিপাড়া এসব তো রয়েইছে। জঙ্গলে গিয়ে গালা তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, মোম সংগ্রহ প্রভৃতি। মাটি, কাঠ, পাথর এসব তো রয়েইছে। অর্থাৎ লোকশিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি ঘটলে উপকৃত হবে অসংগঠিত বহুমাত্রিক ক্ষেত্র। একই সঙ্গে অসংগঠিত বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে কাজ করার আগ্রহ বাড়বে। দারিদ্র দশা থেকে মুক্তির ক্ষমতা প্রতিটি মানুষেরই আছে। শুধু একটু সুযোগ করে দিতে হবে। বাস্তবে সুযোগটি পাচ্ছে সংযোগকারী সংস্থাগুলি। যারা লোকশিল্পীদের কান্নার ছবি দেখিয়ে, অন্য পরিবেশে লোকশিল্পী নিয়ে এসে স্বদেশি বা ঐতিহ্যের ভাঙন ঘটিয়ে ঠুনকো সম্ভাবনার আলো দেখিয়ে বাস্তবে লোকশিল্পের শক্তিকে অস্বীকার করে নিজেদের জীবনযাত্রার মান বদলাচ্ছে। যে শিল্পবস্তু আনন্দ দিতে পারে, তা সৃষ্টিকর্তার দুঃখ ঘোচানোর ক্ষমতাও রাখে। লোকশিল্পীদের দুঃখের কারণ বর্তমান পরিবেশ। পরম্পরাগত শিক্ষা বা চর্চার প্রতি যদি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে এবং লোকশিল্পীদের ক্ষমতার উপর যদি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থেকে থাকে, তাহলে সংযোগকারী শ্রেণীর কোনো প্রয়োজনই নেই।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
**AXIS Bank Ltd.**
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

# ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

## ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

**কামপুরুষার্থ ও শিক্ষা**

সংসারে সব মানুষেরই নিজের একটা ভূমিকা রয়েছে। ওই ভূমিকা অনেক কর্তব্যের বিধান বানিয়েছে। এই কর্তব্যের পালন না করলে বড়ো অব্যবস্থা হয়ে যাবে। এজন্যই কর্ম ত্যাগ করা ঠিক নয়। কর্ম করাই দরকার কিন্তু তার ফলাকাঙ্ক্ষা না করেই করা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, খাবার তো খেতেই হবে কিন্তু তার জন্য মনকে সুখানুভূতি দিতে পারে এই প্রত্যাশায় নয়, বরং শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের ভাব সমূহকে সংস্কারিত করে সত্ত্বভাব বৃদ্ধির সহায়ক হয় এমনটা হওয়া চাই। খাবার গ্রহণ করা দরকার কিন্তু তা স্বার্থ, ভয় বা বাধ্য হয়ে নয়, বরং অন্নগ্রহণকারী সাক্ষাৎ ভগবান এবং খাদ্যগ্রহণের ফলে পরমাত্মার সেবা হচ্ছে এই মনোভাব নিয়েই রান্না করা উচিত। কর্তব্যকর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। কর্তব্যকর্ম করার সময় দুঃখী না হওয়া, কর্তব্যকর্ম দক্ষ হাতে অথবা যত্নে করলে মন নিষ্কাম ভাবের দিকে যায়। অনেকবার এমন হয় যে এইসব সাবধানতার পরেও কর্ম ভালো হয় কিন্তু ফলের আশা অবশ্যই থেকে যায়। ফল না পেলে কর্ম করা মানুষ যদিও-বা না ছাড়ে, দুঃখ অথবা অভিযোগ কিন্তু অবশ্যই থেকে যায়। এমনটা হলে কামনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না এবং কামনাজনিত দুঃখ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় না।

নিষ্কামভাবের সাধনার জন্য একই পথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর তা সংসারের সকল ক্রিয়াকলাপের জন্যই প্রাযোজ্য। সেটা হচ্ছে কার্যের উন্নয়ন সাধন করা। ভোগকে পূজায় রূপান্তরিত করা। উপভোগের উন্নয়ন জঠরাগ্নিতেআহুতি মনে করে যজ্ঞ করা হচ্ছে আহারের উন্নয়ন। মৈথুন সুখরূপী কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করা হচ্ছে মৈথুনের উন্নয়ন। গর্ভাধানকে প্রার্থনায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে গর্ভাধানের উন্নয়ন। সমস্ত শিল্পকলাকে সৌন্দর্যবোধের স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং বিলাসিতা থেকে মুক্ত করা হচ্ছে শিল্পসাধনার উন্নয়ন। জীবনের লক্ষ্য সুখানুভব নয় বরং মোক্ষ— এটা মনে করাই জীবনের উন্নয়ন। আসক্তিকে সমর্পণে রূপান্তরিত করা হচ্ছে আসক্তির উন্নয়ন। অর্থোপার্জন সমাজের সেবায় ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থোপার্জনের উন্নয়ন। প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত উৎকৃষ্টতার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে প্রথম ধাপ এবং এই প্রকারে কৃতকর্মকে উপাসনা, সাধনা, সেবা অথবা পূজায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপের উন্নয়ন। কাম যখন প্রেমে রূপান্তরিত হয় তখন তা শুদ্ধ হয় এবং ব্যক্তির বিকাশের অবলম্বন হয়ে তাকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়।

কামকে উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বরং তা পরমাত্মার ব্যক্ত হবার যে সংকল্প তারই বিশ্বরূপ, সেটা অত্যন্ত সামর্থ্যবান। এটা সাংসারিক জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুখময় করে তোলে। কেবল এর শুদ্ধিকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রেমে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন।

কামের নিয়ন্ত্রণ কে করতে পারে? একটিমাত্র বাক্যে বলতে গেলে কামের নিয়ন্ত্রণ ধর্ম করে থাকে। শ্রী ভগবান স্বয়ং বলছেন, 'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষুকাম্যোস্মি ভারতর্ষভ' অর্থাৎ ধর্মানুকূল কাজ হচ্ছে ভগবানেরই বিভূতি। এজন্য কাজের মাহাত্ম্য বুঝে তার উচিত সম্মান করা দরকার এবং তার সামর্থ্যকে বুঝে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার।

**শিক্ষার ভূমিকা :**

কামপুরুষার্থ হচ্ছে অভ্যুদয়ের স্রোতস্বরূপ। সর্বপ্রকারের ভৌতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্র। একে সুশৃঙ্খল করতে শিক্ষার নিয়োজন দরকার। কামপুরুষার্থের যে শিক্ষা তার বিষয়গুলো এরকম—

(১) জীবনে অনেক প্রকারে আমরা প্রবৃত্ত হয়ে থাকি। মন ও শরীর সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। এই ক্রিয়াগুলির প্রতি সুস্থ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করবার প্রয়োজন আছে। সুস্থ দৃষ্টিকেণের বিকাশ করা শিক্ষার মূল কাজ। সুস্থ দৃষ্টিকোণের বিকাশ হেতু মনের শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। মন সর্বদা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, অশান্ত থাকে। অশান্ত মনের কথা সঠিকভাবে বোধগম্য হয় না। অশান্ত মন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরকম মন না তো কোনো অনুভবকে ঠিকভাবে আস্বাদ করতে পারে আর না ঠিক মতো বিচার করতে পারে।

এজন্যই মনকে শান্ত করবার শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক। মনকে শান্ত করতে খুব ছোটো বয়স থেকে প্রয়াস করতে হয়। শিশু যখন মাতৃক্রোড়ে থাকে, তখন থেকে মধুর সংগীত, কল্যাণকারী বিচারধারা প্রেমপূর্ণ মনোভাবের সংস্কার হওয়া দরকার। মহান ভাব সংবলিত ঘুম পাড়ানি গান ও গল্প মনকে উদার ও শান্ত করতে খুব সাহায্য করে। শিশু যখন কোলে থাকে তখন মা যে চিন্তা করে, যে আহার গ্রহণ করে, বালকের বিষয়ে যে কল্পনা করেন, সন্তানের কাছে যে আশা করেন তার প্রভাব শিশুর চরিত্রের ওপর গভীর ছাপ রেখে যায়।

এজন্য আমাদের পরম্পরায় গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যায় অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে সুন্দর সন্তানের জন্ম হোক এই দৃষ্টিতে ভাবী মাতা-পিতাকে সম্যক দিকনির্দেশ দেওয়া হয়, মায়ের শিক্ষারও খেয়াল রাখা হয় যাতে জন্মগ্রহণকারী শিশু

শুধু শারীরিক দৃষ্টিতেই সুস্থ মানসিকতার হোক এটাই পর্যাপ্ত নয় বরং জন্ম থেকেই সুসংস্কার সঙ্গে নিয়ে আসে এমন ব্যবস্থা করা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আজ এই বিষয়ে ঘোর অব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। বিকাশোন্মুখ তথা বিকশিত সমাজের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে যে সে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উচিত সময়েই কাম পুরুষার্থের শিক্ষা দেয়। তাই উচিত সময় নিঃসন্দেহেই হচ্ছে গর্ভাবস্থা এবং শিশু অবস্থা। শিশু অবস্থায় ঘরের পরিবেশ ও ব্যবহার হচ্ছে শিশুর মনকে ঠিক করবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়। মানসিক শান্তি, তৃপ্তি, সন্তোষ, উদারতা, সখ্যভাব ইত্যাদি পরিবেশ ও ব্যবহার থেকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেটা উপদেশ বা অনুশাসনের মাধ্যমে শেখানো যায় না। শিশু সংস্কার এই বিষয়ে একটা বড়ো দিক যা স্বতন্ত্ররূপে করা দরকার।

বালক যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন সেখানে বিষয় রচনা, গতিবিধির আয়োজন মানসিক অবস্থাকে মাথায় রেখে করা দরকার। উদাহরণরূপে আজকাল বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেকটি গতিবিধির সঙ্গে প্রতিযোগিতা এসে গিয়েছে। প্রত্যেকটি উপলব্ধির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গুরুত্ব চয়ন প্রক্রিয়া যুক্ত হয়ে থাকে। এই প্রতিযোগিতা থেকে সংঘর্ষ ও সংঘর্ষ থেকে হিংসা জন্ম নিয়ে থাকে। এর কাজই হলো বিভ্রান্ত করা। দুর্ভাগ্য প্রতিযোগিতা আমাদের সমগ্র জীবনের অঙ্কে পরিণত হয়েছে, সেটা এখন ব্যক্তিগতই হোক অথবা সামাজিক। আমাদের বিচার প্রক্রিয়ার এটা একটা অঙ্গে

পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রতিযোগিতা আমাদের সন্তানদের মানসিক বিকাশে ক্ষতি করছে এটা আমাদের মনে হয়। এর পরিবর্তন করা দরকার। প্রারম্ভটা বিদ্যালয় থেকে হতে পারে। বিদ্যালয় থেকে প্রতিযোগিতার বিষয়টি বের করে দেওয়ার দরকার। শিশুদের একে অপরের সাহায্য করবার প্রবৃত্তি থাকে। বড়ো হতে হতে আমাদের ব্যবস্থাসমূহের প্রভাবে সেটা নষ্ট হয়ে যায় ও স্বার্থ, ঈর্ষা, লোভ বাড়তে থাকে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তথা কথাবার্তার মাধ্যমে এটার বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করা দরকার। আজকাল সেকথা সর্বতোভাবে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই বিস্মৃতির দুষ্প্রভাব ভীষণরকম ভাবে পড়তে যাচ্ছে, কারণ এই বিস্মৃতি আমাদের কেবলমাত্র মনুষত্বই নয় বরং আসুরী প্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যেমন, সংগীত মনকে শান্ত ও সাত্ত্বিক বানাতে খুব উপযোগী হয়ে থাকে। আজকাল যে ধরনের সংগীত শোনা যায় সেরকম সংগীত কোনো কাজের নয়। এগুলো হচ্ছে বিভ্রান্তিমূলক সংগীত। ভারতীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীত ও ভারতীয় বাদ্য মনকে শান্ত করতে খুব সহায়ক হয়ে থাকে ,এর প্রয়োগ করা উচিত।

(২) মনকে শান্ত ও সংযমী বানাতে যোগ অত্যন্ত কার্যকর। বিশেষ করে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার ও ধ্যানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। আজকাল যোগ বিষয়েরও বিপর্যয় হয়ে গিয়েছে। যোগকে আসন ও শারীরিক প্রায়াসের রূপ দেওয়া হয়েছে। একে একটা চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিণত করা হয়েছে এবং প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনের বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে হবে। পরিবেশ ব্যবস্থা এবং ব্যবহারে সরলতা, সৌন্দর্য, সাত্ত্বিকতা আনা প্রয়োজন। খাওয়া দাওয়াতেও সাত্ত্বিকতা অত্যন্ত আবশ্যক। আজকাল সাত্ত্বিক ভোজন বিনা স্বাদের হয়ে থাকে। শুধু অসুস্থ ব্যক্তিরাই ওটা খেয়ে থাকে এমনটা মনে করা হয়। ছোটোদের খাওয়ার অভ্যাসের দিকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শুধু ছোটোরা নয়, বড়োরা পর্যন্ত আরোগ্য ও সংস্কার দুটোর জন্যই হানিকারক এমন আহার পছন্দ করে থাকেন। কেবল আহারই নয় দিনচর্যাও ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। যে সময়ে যে কাজ করা উচিত, সে কাজ যে প্রকারে করা উচিত সেই সময়ে, সেই প্রকারে করবার কোনো আগ্রহ থাকছে না। এই বিষয়ে খুব অলসতা রয়েছে। কেবল অজ্ঞতাই নয়, বিপরীত জ্ঞান রয়েছে। একে ঠিক করা দরকার।

(৩) মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রটি ভীষণ সংকট তৈরি করে ফেলেছে। সিনেমা, ধারাবাহিক নাচ-গানের কার্যক্রম ও বিজ্ঞাপন একদিকে মনের নিম্নতর ভাবসমূহকে বিভ্রান্ত করছে। অন্যদিকে বাসনাসমূহের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। সংযমকে আবশ্যক মানাই হয় না, এজন্য তার শিক্ষাও কোনো ভাবে হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে আজ সাধুসন্ত, সন্ন্যাসী, ধর্মাচারী, শিক্ষক অথবা কোনো বোধসম্পন্ন মানুষের নিয়ন্ত্রণ বা নির্দেশ নেই। এই ক্ষেত্রটি কেবল বাজার দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং কামোপভোগের কারণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে পয়সা রোজগার করারই চিন্তা করে থাকে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ বের করবার প্রয়োজন রয়েছে।

(৪) কামজীবনের সুস্থতার জন্য কেবল ত্যাগ ও সংযমই নয়। আমোদ প্রমোদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। শিশু অবস্থা থেকে শুরু করে বড়ো আয়ু পর্যন্ত রসিকতা, সৌন্দর্যবোধ, উঁচু এবং সংস্কারিত রুচি এবং আভিজাত্যের বিকাশ করা উচিত। আজকে দেখা যায় যে, নাচ-গান, খেলা ইত্যাদির রস নিষ্ক্রিয় দর্শক বা শ্রোতারাই গ্রহণ করে। লোকে গান শোনে, কিন্তু গায় না। নাটক অথবা খেলা উপভোগ করে, কিন্তু নিজে অংশ নেয় না। নৃত্য দেখে, কিন্তু নিজে অনুশীলন করে না। সুস্বাদু খাবার খায় কিন্তু রাঁধে না। এরা যখনই নাচে বা গান করে

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

তখন অত্যন্ত কুরূপ এবং ভাঁড়ের রূপ নেয়। মনোরঞ্জনের এই ক্রিয়াকলাপগুলো সক্রিয় হলেই সত্যিকারের রসিকতার বিকাশ হয়ে থাকে। কল্পনাশীলতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ হয়ে থাকে। মন স্বচ্ছ ও সুস্থ হয়ে থাকে এবং কামের উন্নয়ন হয়ে থাকে। আহার, বস্ত্র, অলংকার, সংগীত, নৃত্য, নাটক, পর্যটন ইত্যাদিতে সংস্কার হওয়া দরকার। এর শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শিক্ষা বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে উভয় ক্ষেত্রেই দেওয়া দরকার। বাস্তবে এগুলির মুখ্য কেন্দ্র হচ্ছে বাড়ি। কিন্তু আজ বাড়ি এই শিক্ষার জন্য সক্ষম না হবার কারণে বিদ্যালয়কে বাড়ির ভূমিকারও পথনির্দেশ করবার দায়িত্ব পালনের দরকার।

(৫) কলা ও কারিগরির রক্ষা ও উন্নয়ন করারও মহতী আবশ্যকতা রয়েছে। এই দৃষ্টিতে ছাত্রদের হাতে হাতে কাজ করা শেখানো এবং প্রত্যেকটি কাজ উত্তম পদ্ধতিতে করে উৎকৃষ্টতার স্তরে নিয়ে যাওয়া শেখানো উচিত। শিক্ষা কেবল লেখাপড়া ও লিখিত পরীক্ষার জন্য হয় না। এটা প্রত্যেকটি স্তরে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির হাত কুশল কারিগরের মতো হওয়া দরকার। প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেবা ভাবযুক্ত হওয়া দরকার। চিত্তশুদ্ধির জন্য সেবাভাব হচ্ছে অত্যন্ত জরুরি। সৃজনশীলতার বিকাশ, উৎকৃষ্ট নির্মাণ কৌশল, সেবাভাব সৃজন থেকে প্রাপ্ত আনন্দ কামনার উন্নয়ন ঘটায়। এর প্রভাব সমাজজীবনের ওপরও পড়ে। সমাজে এক প্রকারের শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেষ্ঠ সমাজে সুসংস্কার সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কামপুরুষার্থ সমাজে কাউকে দরিদ্র অথবা নির্ধন থাকতে দেয় না। কামপুরুষার্থ সমাজকে আলস্যেও থাকতে দেয় না। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত কাম সমাজকে সংস্কারিত সমৃদ্ধি তথা উদ্যমকে সবিনয়ে অলংকৃত করে থাকে।

(৬) স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধের ক্ষেত্র খুব মনোযোগ দেবার যোগ্য। আজ এটা বিশেষ চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শ্লীলতাহানি ও অনাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে, নারীরা সুরক্ষিত নয়, পুরুষ নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে। নারীরাও লজ্জাকে ত্যাগ করে চলেছে। বস্ত্রালংকার, প্রসাধন, অঙ্গবিন্যাস, বসাচলা ইত্যাদিতে মর্যাদার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উন্মুক্ততা তথা স্বৈরাচারকেই স্বাধীনতা বলা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শেখানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। নারীর প্রতি পুরুষদের এবং পুরুষদের প্রতি নারীদের দৃষ্টিকোণ উভয়েরই সুস্থ করার আবশ্যকতা আছে। দূরদর্শনের সম্প্রচারিত বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। বালক- বালিকা, কিশোর,-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের পরস্পর সম্পর্ক সুস্থ কীভাবে তৈরি করা যায় সেই শিক্ষা সেই সেই স্তরের বিদ্যালয়ে এবং ঘরে আগ্রহসহকারে দেওয়া উচিত। আজ এ বিষয়ে সর্বত্র উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। এটা ত্যাগ করা দরকার। সেই স্থানে বিনয়, নারীদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহারের শিক্ষা ছাত্রদের প্রাপ্ত হওয়া দরকার। পতি-পত্নীর সম্বন্ধকে কামুকতা থেকে মুক্ত করে একাত্মতার দিকে বিকশিত করা দরকার। এর অনুকূল ব্যবস্থা কেমন হবে, সেটাও শিক্ষার বিষয়। মহাবিদ্যালয় শিক্ষয় এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া দরকার।

(৭) যৌন শিক্ষাও তরুণদের শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এটা সামগ্রিক শিক্ষার বিষয় নয়। এটা ব্যক্তিগত শিক্ষার বিষয়। এটা শাস্ত্রীয় রূপে বিদ্যালয় এবং ব্যবহারিক রূপে পরিবারে দেবার অনিবার্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এর অভাবেই মানুষের কামজীবন বিপথগামী হয়।

(৮) বিবাহ হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন অনিবার্য হওয়া উচিত। ব্রহ্মচর্যহীন সমাজ অত্যন্ত অসংযমী হয়ে থাকে। ব্রহ্মচর্য পালনকে সহজ করবার জন্য আহার বিহারের চিন্তা করা দরকার। এটা আগ্রহপূর্ব সমাজ ও ছাত্রদের মানসপটে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। সামাজিক শিষ্টাচারের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়া দরকার।

(৯) কামপুরুষার্থের জন্য শিক্ষা কেমন হবে তার এখানে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে একটি বিন্দুর অধিক বিবেচনা স্বতন্ত্রভাবে করবার আবশ্যকত আছে। শিক্ষায় সর্বতোভাবে উপেক্ষিত এই বিষয়টি পুনঃস্থাপনের দৃষ্টিতে শিক্ষাবিদ ও সমাজ কল্যাণকারী চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টা করা উচিত। ধর্মাচার্যদের এই বিষয়কে নিজের উপদেশের বিষয় করা উচিত। কলা, সাহিত্য, খেলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই বিষয়ের চর্চা হওয়া উচিত। সবচাইতে মুখ্য স্থান হচ্ছে গৃহ। পরিবার শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত করলে এবং তাতে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিলে কিছু ফল পওয়া যেতে পারে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিকল্পনা তৈরি হওয়াও দরকার। লেখকদের এই বিষয়কে নিয়ে যুগানুকূল সাহিত্য সৃষ্টির আবশ্যকতা রয়েছে। কামপুরুষার্থ ঠিক হলে অর্থ পুরুষার্থও ঠিক হয়ে যায়। কাম ও অর্থ ঠিক হলে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুখ ও আনন্দের প্রাপ্তি হয়। ইহলৌকিক জীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

*(ক্রমশ)*

***ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত***
***প্রাক্তন অধ্যাপক***

*With Best Compliments form :*

A
Well Wisher

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

Dil main
INDIA
Let's
illuminate
the nation
with
Make in India
SURYA
MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES
AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657